সেমেটিক লিপিতে বাংলা পাণ্ডুলিপি: ভাষা-বৈচিত্র্য এবং পাঠাভ্যাস (আনু. ১৬১০-১৯৪৭ অব্দ)

শহিদুল হাসান

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookSahidul

বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপিতে পাণ্ডুলিপি অনুলিপির ঐতিহ্য প্রায় সহস্রাব্দ-প্রাচীন। উনিশ শতকের বটতলার ছাপাখানার পুথির মাধ্যমে হাতে লেখা পুথির জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে। বাংলা পাণ্ডুলিপি বিষয়ক গবেষণায় বিগত পাঁচ দশকে বাংলা লিপির পাশাপাশি সেমেটিক তথা আরবি-ফারসি লিপিতে অনুলিপিকৃত বাংলা ভাষায় রচিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপির পাঠ ও সম্পাদনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে *শরীয়ত-নামা*, *নুরনামা* এবং *ফাতেমার সুরতনামা*। কালানুক্রমিক মানদণ্ডে এ তিনটি কাব্যই সপ্তদশ শতকের এবং এদের অনুলিপিগুলি সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতকে সৃষ্ট। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি এবং বাংলা একাডেমির পাণ্ডুলিপি শাখায় আরবি-ফারসি হরফে অনুলিপিকৃত বেশ কিছু বাংলা পুথি রয়েছে। সেমেটিক লিপিজাত আরবি-ফারসি হরফ ব্যবহার করে বাংলা পাণ্ডুলিপি লেখা ও কপি করার প্রয়োজন কেন হয়েছিল? পাণ্ডুলিপিগুলির পাঠক এবং শ্রোতা কারা? কোন জনপরিসরে এ ধরনের পাণ্ডুলিপির জনপ্রিয়তা ছিল? পাণ্ডুলিপিগুলোর উপস্থাপকদের পারফরমেন্স কেমন ছিল? বর্তমান গবেষণায় সেমেটিক লিপিতে লিখিত বাংলা পুথিসমূহ– পাঠোদ্ধারকৃত এবং প্রকাশিত– আকরসূত্র হিসেবে ব্যবহার করে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াস নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত অপ্রকাশিত পুথিগুলিকেও বর্তমান গবেষণায় পুনর্বিবেচনা করা হবে। জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে বাংলা ভাষার পুথির বহুত্ববাদী চরিত্র এবং সামাজিক পরিসরে পুথি-পাঠের ইতিহাস তুলে ধরাই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য।

> বাল্যকালে দেখেছি, জ্যোৎস্নার রাত্রে গ্রামের গলিতে একদল (দশ-পনেরো বছরের) কিশোর হাডু-ডুডু খেলতো, আর একদল (বিশ-পঁয়তিরিশ) বছরের যুবকও খেলায় রত থাকত; বিকেলবেলায় ঘরের দাওয়ায় বসে পুঁথি পাঠ চলতো, গ্রামের বহু লোক তা শুনতে আসতো। এক ধরনের পুঁথি ছিল শহীদে কারবালা, মেসবাহুল ইসলাম, শাহনামা ইত্যাদি; আর এক ধরনের জঙ্গনামা, আমীর হামজা, হাতেম তাই ইত্যাদি; অন্য ধরনের জৈগুন বিবি, সোনাভান, সূর্যউজাল বিবি ইত্যাদি। ... আমার পিতাও ছিলেন সুকণ্ঠ পাঠক। পুঁথির বহুলাংশ তাঁর মুখস্থ ছিল। হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হজরত মুহম্মদ (স.) পর্যন্ত অনেক ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনী সময়-সময় পুঁথি-পুস্তক না দেখে তিনি আউড়িয়ে যেতেন। তাতে অনেক উপদেশ থাকতো, সেগুলোও অমি মনে রাখবার জন্য একটু বিশেষ যত্ন নিতাম (হোসেন, ২০২২, পৃ. ১৫)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের খ্যাতিমান শিক্ষক কাজী মোতাহার হোসেনের *স্মৃতিকথায়* সামাজিক পরিসরে পুথিপাঠের এই আসরের স্থানিক ঠিকুজি হলো বর্তমান রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার বাগমারা গ্রাম। কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর পিতার মতো নিজেও পুথি পড়ার স্বপ্ন দেখতেন।

তাঁর বর্ণ-পরিচয় হয় সাত বছর বয়সে এবং এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'ঐ বয়স উত্তীর্ণ হবার পর আমার নিজের মনেই এসেছিল, আমিও কিতাব পড়ব, আদম-নুহ-ইব্রাহিম-মূসা-ঈসা-হজরত মুহম্মদ সবার বিষয়ে জানবো' (হোসেন, ২০২২, পৃ. ১৫)। নবি-রাসুলদের জীবনচরিত ও *কিস্‌সা* সংকলন *কাসাসুল আম্বিয়া* পুথি পড়ার রেওয়াজ হয়তো এই গণিত বিশেষজ্ঞ-সাহিত্যিকের মনে এরকম ইচ্ছার বীজ বপন করেছিল।

অষ্টাদশ শতকের সত্তরের দশকে বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার খাজনা আদায়ের অনুমতি পায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কালক্রমে পুরো হিন্দুস্থানে কোম্পানির এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ রাজের হুকুমত কায়েম হয়। বেনিয়া কোম্পানির ট্যাক্স কালেকশন এবং হাকিমের দণ্ড সবল রাখার তাগিদে প্রয়োজন হয় স্থানীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি-কায়দা-কানুন জানার। হুকুমতের স্থায়িত্ব ও অর্থনৈতিক ফায়দাকে পোক্ত করার জন্য স্থানীয়দের জ্ঞানকাঠামোকে পাশ্চাত্যের লেবাসে সাজানোর প্রকল্প গ্রহণ করেন উনিশ-বিশ শতকের ওরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্যবিদগণ। উইলিয়াম জোনস কিংবা ভট্ট মোক্ষমূলর (জার্মান ভাষাবিদ ম্যাক্সমুলার)-দের রাহা অনুসরণ করে কালক্রমে দক্ষিণ এশীয় পণ্ডিতরাও নিজেদের অতীত রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সংস্কৃত ভাষার পুথি সংগ্রহ, তালিকাভুক্তি, সম্পাদনা ও প্রকাশের মাধ্যমে পুথিবিষয়ক বিদ্যা ক্রমান্বয়ে শাস্ত্রীয় কাঠামোর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এক্ষেত্রে জার্মান দেশীয় রোমান্টিসিজমের হাওয়া এসে দোলা দেয় প্রাচ্যদেশীয় পুথিচর্চায়। বিশ শতকের শুরুতেই (১৯০৬) বাংলা ভাষার আদিরূপ সম্বলিত পাণ্ডুলিপি খোঁজার সাফল্যের মুকুট শিরোধার্য করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তালপাতায় লেখা লুইপা, কাহ্নপা এবং সরহপাদের কবিতা উদ্ধার হয় নেপালের রাজদরবার থেকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সমসাময়িক আরেকজন পুথি-গবেষক তখন চষে বেড়াচ্ছেন পদ্মা, মেঘনা, যমুনাবাহিত গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের গ্রামে-গঞ্জে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো করে হন্যে হয়ে চষে বেড়াচ্ছেন বাংলার আনাচেকানাচে। ১৯০৯ সালে চট্টল ধর্মমণ্ডলী সভা এই পুথিসাধক পণ্ডিতকে উপাধি দিয়েছিল 'সাহিত্যবিশারদ'; কেতাবিভাবে যিনি পরিচিত ছিলেন মুন্সি আবদুল করিম নামে। ইতোমধ্যে কলকাতায় গড়ে উঠেছে চিৎপুর-গগনহাটা-বটতলার পুথির মার্কেট। হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি বা 'কলমি পুথি' থেকে বই পড়া বা সামাজিক পরিসরে পুথিপাঠের আসরে স্থান করে নিয়েছে বটতলার ছাপার অক্ষরের কিতাব *কাসাসুল আম্বিয়া*, *য়ুসুফ জোলেখা*, *লাইলা-মজনু*, *বাহার দানেশ*, *শাহনামা* ইত্যাদি (ভদ্র, ২০১১, পৃ. ২০৩-৫৯)।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগৃহীত বাংলা পাণ্ডুলিপির বেশিরভাগই বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত। ইন্ডিক তথা দেশীয় ভাষার পাণ্ডুলিপির এই সংগ্রহটি সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্য-শিল্প এবং চিন্তার ইতিহাসের প্রাথমিক উৎসের খনি। এই সংগ্রহ গড়ে তোলার মূল কারিগর ছিলেন মুন্সি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও গবেষণা ছিল যাঁর ধ্যান-জ্ঞান-ধর্ম। বাংলা ভাষায় রচিত পাণ্ডুলিপিগুলি শাস্ত্র, কাব্য, ধর্ম, দর্শনসহ নানা প্রকরণে সুবিন্যস্ত। বাংলা বর্ণমালার পাশাপাশি আরবি-ফারসি হরফে বাংলা ভাষায় লেখা পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে রয়েছে (চিত্র ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫)। যেমন, *ফাতেমার সুরতনামা*, *শরীয়ত-নামা*, *ওফাতে রসূল*, *কোরানের কায়দা*, *নুরনামা*, *সকিনা বিলাপ*, *ফক্করনামা*, *ইবলিশনামা* ইত্যাদি। বাংলা একাডেমির সংগ্রহশালায় সেমেটিক[১] বর্ণমালায় অনুলিপিকৃত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ৪০টি (বিশ্বাস, ১৯৯৫, পৃ. ৮৬, ১৮৮-২১৪)।

সাহিত্যবিশারদ তদীয় সংগৃহীত আরবি-ফারসি লিপিতে বাংলা পুথি লেখার কারণ হিসেবে অধিকাংশ মুসলিমদের বাংলা না জানা এবং আরবি ভাষা জ্ঞানকেই চিহ্নিত করেন। তিনি লিখেছেন:

> পুস্তকের বহুল প্রচার ও মুসলমান পাঠকদিগের সুবিধার নিমিত্তে পূর্বে অনেক পুঁথি আরবীয় বর্ণমালায় লিখিত হইয়াছিল।... বাঙ্গালা বর্ণমালার অনুরূপ আরব্য ভাষায় সকল বর্ণ নাই, কিন্তু পারস্য ভাষায় কতকটা আছে। তদস্থলে পারস্য বর্ণমালার সাহায্যে বাঙ্গালা শব্দগুলি লিখিত হইয়াছে (সাহিত্যবিশারদ, ১৩২১ ব., পৃ. ৬৫-৬৬)।

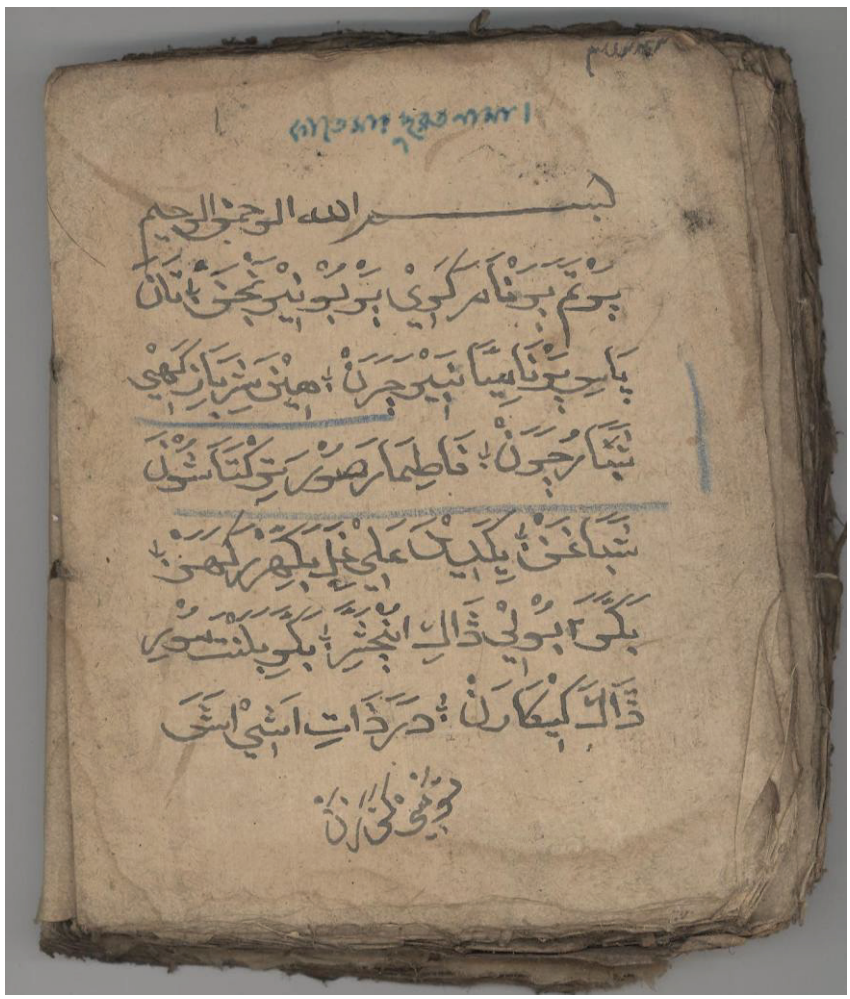

চিত্র ১: *ফাতেমার সুরতনামা*, আরবি হরফে বাংলা পুথি
(ছবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার)

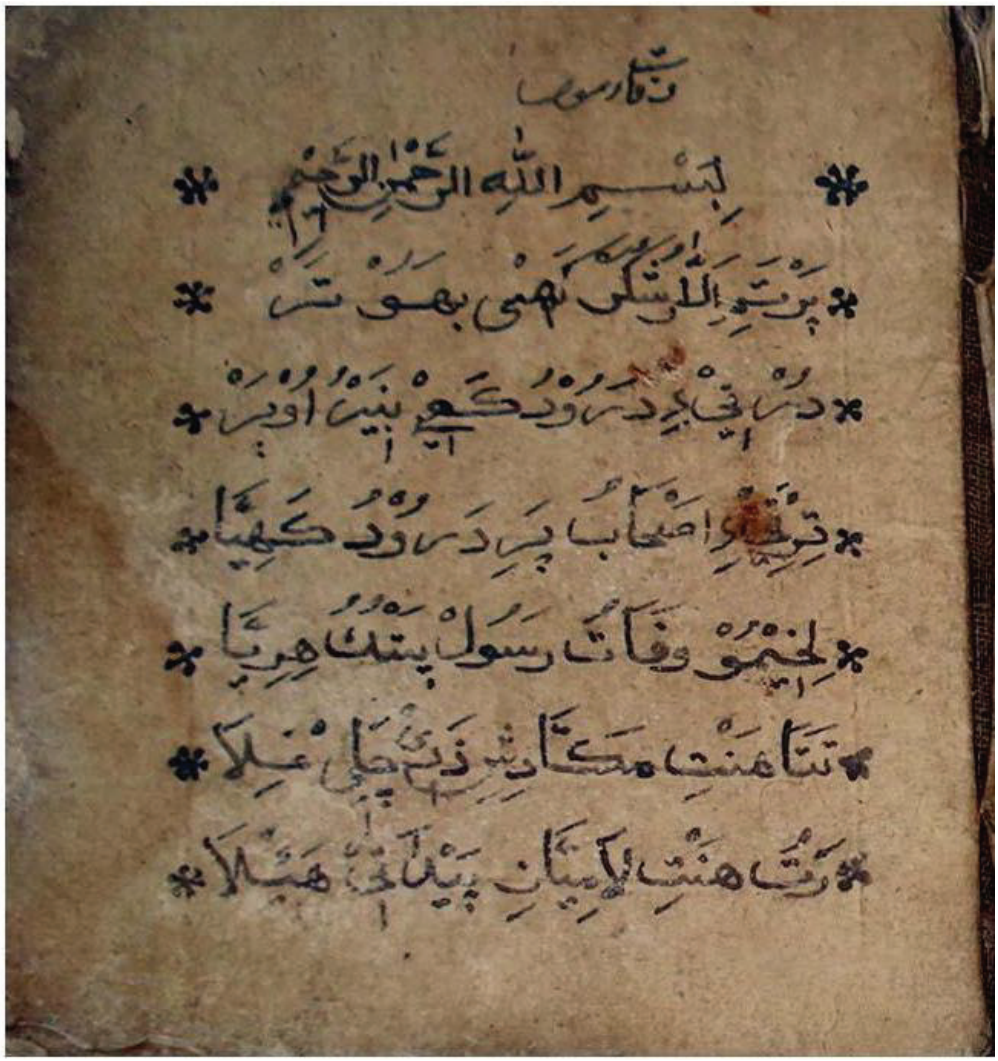

চিত্র ২: সৈয়দ সুলতান রচিত *ওফাতে রসূল*, আরবি হরফে বাংলা পুথি
(ছবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার)

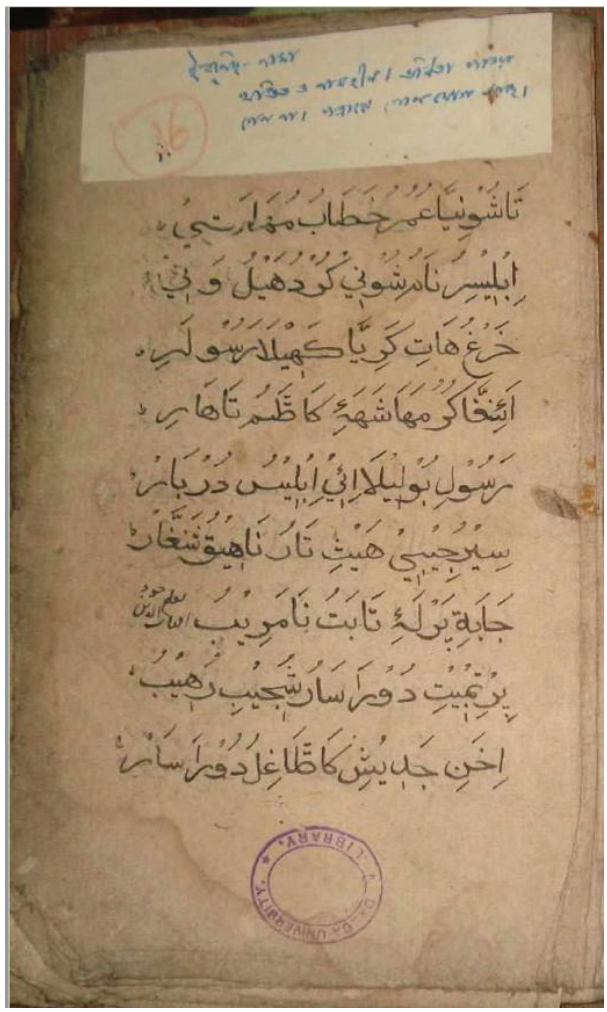

চিত্র ৩: সৈয়দ সুলতান রচিত *ইবলিশনামা*, আরবি হরফে বাংলা পুথি
(ছবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার)

চিত্র ৪: আবদুন নবী রচিত *কোরানের কায়দা*, আরবি হরফে বাংলা পুথি
(ছবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার)

চিত্র ৫: অজ্ঞাত লেখকের *নিকাহ মঙ্গল*, আরবি হরফে বাংলা পুথি
(ছবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার)

বাংলা পুথিসাহিত্য এবং লিপিবিষয়ক গবেষক এস এম লুৎফর রহমান সাহিত্যবিশারদের পুথি-সংগ্রহে থাকা আরবি-ফারসি হরফে অনুলিপিকৃত তেত্রিশটি বাংলা পুথির একটি ফর্দ তৈরি করেছিলেন (রহমান,

২০০৫, পৃ. ২৯১-৯৫)। সেমেটিক লিপিজাত আরবি-ফারসি হরফ ব্যবহার করে বাংলা পাণ্ডুলিপি লেখা ও কপি করার প্রয়োজন কেন হয়েছিল? এ ধরনের পুথির বিষয়বস্তু কী ছিল? পাণ্ডুলিপিগুলির পাঠক এবং শ্রোতা কারা? কোন জনপরিসরে এ ধরনের পাণ্ডুলিপির জনপ্রিয়তা ছিল? পুথি পাঠকদের উপস্থাপনের (performance) কায়দা কেমন ছিল?

বাংলা ভাষার বিকাশ ও বাংলা লিপির বিবর্তনের পথে আরবি-ফারসি অক্ষরে বাংলা লেখার এ পদ্ধতি কবে থেকে শুরু হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সেমেটিক লিপিতে লিখিত বাংলা পুথি—পাঠোদ্ধারকৃত এবং প্রকাশিত—আকরসূত্র হিসেবে ব্যবহার করে উত্থাপিত সাওয়ালগুলির জাওয়াব খোঁজার জটিল ভুলভুলাইয়াতে যাওয়ার পাশাপাশি হালফিলের গবেষকদের মতামতকে পুনর্বিবেচনার প্রচেষ্টা বর্তমান প্রবন্ধে করা হয়েছে। প্রায় চার শতকের দীর্ঘ পাটাতনে বর্তমান প্রবন্ধে উত্থাপিত প্রস্তাবনাগুলি লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কের অবজেকটিভিটির নিক্তিতে যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণ সমর্থিত না হবার ঝুঁকি রয়েছে। এ ঝুঁকি মেনে নিয়েই পরবর্তী আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

বর্তমান প্রবন্ধটি ছয়টি অংশে বিভক্ত: ১) পূর্ববর্তী প্রস্তাবনা, ২) নসরুল্লাহ খোন্দকার রচিত *শরীয়ত-নামা*, ৩) কবি শেরবাজ রচিত *ফাতেমার সুরতনামা*, ৪) মোহাম্মদ শফি রচিত *নুরনামা*, ৫) সেমেটিক লিপিতে বাংলা পুথির রসম: বহুমাত্রিকতার স্বরূপ অনুসন্ধান এবং ৬) পুথি পাঠ ও পুথি প্রকাশ: শিকড়ের পানে বর্তমানের অনুসন্ধান।

১) পূর্ববর্তী প্রস্তাবনা

বাংলা ভাষায় পাণ্ডুলিপি অনুলিপির কোন পর্যায়ে এবং কী প্রেক্ষাপটে আরবি-ফারসি হরফে বাংলা লিখনরীতি শুরু হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। বাংলা ভাষার এবং লিপির বিবর্তনের ইতিহাস গবেষণায় বিষয়টি নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেন এ ধরনের পদ্ধতির প্রয়োজন হয়েছিল? কোন স্থানিক পরিমণ্ডলে এবং কোন জনগোষ্ঠীর জন্য এই রীতিতে পুথি অনুলিপি করা হলো? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পণ্ডিতগণ নানাভাবে দিয়েছেন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *The Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের একটি ধ্রুপদি গবেষণাকর্ম। বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস নথিভুক্তিতে সুনীতিকুমার অনেক ক্ষেত্রেই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের কাছে ঋণী। তিনি সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহে থাকা আরবি-ফারসি লিপিতে বাংলা লেখা পুথিগুলিকে পূর্ব-বাংলায় প্রচলিত ভাষার ধ্বনিবিদ্যার জন্য মূল্যবান সূত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহের পাশাপাশি তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের মধ্যেও এ ধরনের (পুথি নং ৮৭, ৯৯, ১২৪ এবং ২৭৮) বাংলা পুথি দেখেছিলেন। সুনীতিকুমার প্রস্তাব করেছিলেন, ত্রয়োদশ শতকে—হয়তো এর আগেই— চট্টগ্রাম এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে আরবি হরফে বাংলা লেখার রীতি শুরু হয়েছিল। তবে বাংলার অন্যান্য এলাকায় মুসলিমরা বাংলা অক্ষরেই বাংলা পুথি লিখতেন এবং পুথি কপি করতেন। এই রীতির পাণ্ডুলিপিগুলির ভাষা উত্তম বাংলা। পুথিগুলি ইসলাম ধর্মের নানাবিধ ভাবনা সম্বলিত এবং এগুলিতে মুসলমানি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বেশি। পুথিগুলিতে আরবি-ফারসি শব্দগুলি আদিরূপেই উপস্থাপিত; তবে বাংলা ও সংস্কৃত শব্দ লেখার ক্ষেত্রে ধ্বনিরূপকেই অনুসরণ করা হয়েছে।

এই পুরোধা ভাষাবিদ তাঁর গ্রন্থে বাংলা অক্ষরগুলির আরবি প্রতিবর্ণীকরণের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছিলেন (Chatterji, 1926, p. 229-31)।

এস এম লুৎফর রহমান মনে করেন, মুসলিম আমলের শেষদিকে আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রচলন বাড়তে থাকে। কালক্রমে এই প্রবণতা সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে মনে করেন, শুদ্ধতাবাদী ধর্মভীরু নিষ্ঠাবান মুসলমানরাই কেবল আরবি অক্ষরে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করতেন (রহমান, ২০০৫, পৃ. ২০৯)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আরবি অক্ষরে বাংলা ভাষায় ধর্মীয় কিতাবাদির সঙ্গে সঙ্গে গল্প-কল্প-কাব্যও লেখা হয়েছে। পুথি রচনা নয় বরং পুথি অনুলিপির ক্ষেত্রেও আমরা এই লিখনরীতির ব্যবহার দেখেছি। এর সমর্থন পাওয়া যায় লুৎফর রহমানের বক্তব্যে:

> বিদ্যমান পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা ক'রলে দেখা যায় – আরবী হরফে বাঙালা ভাষায় কেবল ধর্মীয় কেতাবাদি লেখা হয়নি, সেই সঙ্গে গল্প-কল্পকাহিনীমূলক কাব্যও লেখা হ'য়েছে। এ রীতিতে কেবল ছোট ছোট পুথি নয়, 'আমীর হামজা'র মত বড় বড় কেতাবও লেখা হয়েছে। লেখা হয়েছে – আলাওলের 'পদ্মাবতী'র মত সংস্কৃত-প্রধান বাঙালায় লেখা কাব্যও (রহমান, ২০০৫, পৃ. ২০৯)।

মুহম্মদ এনামুল হক এ ধরনের পুথি-রীতিকে উনিশ শতকীয় প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করেন। এই গবেষক কর্তৃক ব্যবহৃত কবি জান মুহম্মদের *নমাজ-মাহাত্ম্য* কাব্যের ছয়টি অনুলিপির মধ্যে দুটি ছিল আরবি হরফে লিখিত। ১৮৫২ সালে রচিত *নমাজ-মাহাত্ম্য* কাব্যের ভণিতা অংশে কবি লিখেছিলেন:

> আর এক কথা কহি শুন বন্ধুজন।
> আরবী অঙ্গুলে যদি বাংলা লিখন ॥

এই পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি এই গবেষক কবি আলাওলের *পদ্মাবতী* কাব্যের একটি আরবি হরফে অনুলিপিকৃত পুথিকে ব্যবহৃত কাগজ ও লিপিবিদ্যার নিরিখে উনিশ শতকীয় হিসেবে শনাক্ত করেন। তাঁর মন্তব্য হলো: ''ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিক হইতে স্বল্পসংখ্যক বাঙালি মুসলিম কবি ধর্ম-বিষয়ে বাংলা-ভাষায় পুস্তক লিখিতে যাইয়া বাংলা অক্ষরের পরিবর্তে আরবী হরফ প্রবর্তনের চেষ্টা করিতেছিলেন বলিয়া মনে হয়'' (হক, ২০০১, পৃ. ৩৫)। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় সময়-নির্ধারক এ প্রস্তাব মেনে নেওয়া বিভ্রান্তিকর হবে; কেননা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে অনুলিপিকৃত এই রীতির একাধিক পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি শাখায় রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, লুৎফর রহমানের প্রস্তুতকৃত তালিকায় দুটি পুথির তারিখ যথাক্রমে ১৬৭৩ এবং ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দ (রহমান, ২০০৫, পৃ. ২০৯)। সম্ভবত এনামুল হক গুরু সাহিত্যবিশারদের মতকেই অনুসরণ করেছিলেন। সাহিত্যবিশারদ *সওগাত* পত্রিকায় 'বাঙ্গালার প্রাচীন মুসলমান কবি' শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধে একই পত্রিকায় প্রকাশিত আবদুল কাদিরের প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করেন। আবদুল কাদিরের নিবন্ধের নামও ছিল 'বাঙ্গালার প্রাচীন মুসলমান কবি'। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, কবি আলাওল তাঁর *পদ্মাবতী* কাব্য ফারসি অক্ষরে লিখেছিলেন। এ প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়ে সাহিত্যবিশারদ লিখেছেন:

> আলাওল তাঁহার পুঁথিখানি 'ফারসি' হরফে লিখিয়াছিলেন, প্রকাশকের উক্তি আদৌ সত্য নহে। আলাওল কোন হরফে লিখিয়াছিলেন, সে কথা বলা এখন সম্ভব নহে। যদি

> বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য কোন হরফে তিনি লিখিয়াও থাকেন, তাহা 'ফারসী' হরফে নহে 'আরবী' হরফেই বটে। আরবীতে (অক্ষরে) লেখা পদ্মাবতী এবং আরো বহু পুঁথি আমার নিকট সংরক্ষিত আছে। এক সময়ে চট্টগ্রামে আরবী হরফে বাঙ্গালা লেখার একটা রীতি প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় (করিম, ২০২৩, পৃ. ৪০)।

বাংলা লিপিবিশারদ এস এম লুৎফর রহমান সুনীতিকুমারের প্রস্তাব অনুসরণ করে প্রায় একই রকমের মত প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন, মুঘল আমলে এসে বাংলা ভাষায় বিপুল পরিমাণ আরবি, ফারসি, তুর্কি এবং উর্দু শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে। ফলে এ শব্দগুলি আরবি বর্ণমালায় লেখা সহজ ছিল। এই পদ্ধতি অত্যধিক জনপ্রিয় হয়েছিল। এমনকি সংস্কৃত-প্রধান সাহিত্যকর্মগুলির অনুলিপিতে *কাতেব*গণ (মুসলিম ও হিন্দু) সহজেই শত শত পৃষ্ঠা আরবি হরফে বাংলা ভাষায় অনুলিপি করতে অভ্যস্ত ছিলেন। বর্ণমালার প্রতি অনুরাগের পাশাপাশি লুৎফর রহমানের প্রস্তাবে আরেকটি সংযোজন ছিল মধ্যযুগের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস (রহমান, ২০০৫, পৃ. ২৪৭-৪৮)। এই গবেষকের মতে, বাংলা লিপি বর্জনের আরেকটি কারণ হলো এর তান্ত্রিক সংযোগ। এ বিষয়টি বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং বাঙালি মুসলমানেরও জানা ছিল। ফলে উভয় সম্প্রদায় এ লিপিকে অবৈদিক ও অনৈসলামিক লিপি বলে পছন্দ করতে পারেননি (রহমান, ২০০৫, পৃ. ২৪৮)।

বর্তমান গবেষক এ প্রস্তাবের সাথে দ্বিমত করছেন। কেননা সমকালীন আকরসূত্রগুলিতে এ ধরনের পছন্দ-অপছন্দের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি। লুৎফর রহমানের রচনায় উত্তর ভারতে উর্দু লিপির বহুল প্রচলন অথবা বাংলা ভাষায় বিপুল পরিমাণ আরবি ও ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশের কারণে এ ধরনের লিপিরীতি উদ্ভবের পক্ষে প্রামাণিক দলিল নেই। প্রসঙ্গত, *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ: জীবন ও কর্ম* গ্রন্থে সেমেটিক লিপিতে বাংলা পুথি আরবি হরফ জ্ঞানসম্পন্নদের জন্য লেখা হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। লেখকের ভাষায়:

> মুসলমানেরা বাংলা ভাষার চর্চা না করলেও আরবি ও ফারসি চর্চা তাদের মধ্যে ছিল। বাংলা চর্চা যে একেবারে ছিল না তাও বলা যায় না, কারণ উনবিংশ শতাব্দীতেই অনেক প্রাচীন কাব্য আরবি অক্ষরে লিখিত হতে দেখা যায়। মুসলমান শিক্ষিত লোকেরা আরবি অক্ষর চিনত, কারণ তারা আর কিছু না হোক পবিত্র কোরআন পাঠ করতে জানত। তাই আরবি অক্ষরে বাংলা লেখাতে বাংলা অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত না হয়েও তারা বাংলা কাব্যের স্বাদ নিতে পারতো (করিম, ১৯৯৪, পৃ. ৫০-৫১)।

২০২০ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় থিবো দুবের এই লিখনরীতির নানা দিক তুলে ধরেছেন। এ পদ্ধতিতে *আমীর হামজা*, *নবীবংশ*, *জঙ্গনামা*'র মতো পুথি ছাড়াও নানা ক্ষুদ্র কাহিনি বা কাঠামোর পুথি অনুলিপি করা হয়েছে। তিনি এটিকে 'বিস্মৃত অধ্যায়' হিসেবে আখ্যা দিলেও পাঠকের সামনে এর দেশজ রূপ উপস্থাপন করেছেন (দুবের, ২০২০)। তাঁর মতে, ''আঠার শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আরবি হরফে লিখিত বেশিরভাগ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির অনুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল ও সংরক্ষণ করা হয়েছিল চট্টগ্রাম এবং আরাকান অঞ্চলে যা আজকের মিয়ানমারের অংশ'' (দুবের, ২০২০, পৃ. ১৪৪৯)। তবে এ রীতির প্রারম্ভিক পর্ব ছিল সপ্তদশ শতক। এ রীতি প্রচলনের কারণ হিসেবে 'স্থানীয় সাহিত্যের ইসলামিকরণ' বলা হলেও থিবো এরকম দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়ে বাংলা লিপির ইতিহাস ও পুথি লেখার পদ্ধতিগত বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করছেন। রিচার্ড সলোমনের

Indian Epigraphy: A Guide to the Study of Inscriptions in Sanskrit, Prakrit and the other Indo-Aryan Language গ্রন্থের আলোকে থিবোর প্রস্তাব হলো: পঞ্চদশ শতক থেকেই বাংলা ও দক্ষিণ-পূর্বের স্থানীয় ভাষাসহ সংস্কৃত পুথির অনুলিপিতে ব্যবহৃত বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছিল সিদ্ধমাতৃকা অক্ষর থেকে। বাংলা ভারতীয় অক্ষররীতির পাশাপাশি 'সংস্কৃত লেখ্যরীতির বৃহত্তর পরিসরের উত্তরাধিকারী' হয়ে উঠেছিল (দুবের, ২০২০)। তাহলে কেন স্থানীয় বর্ণমালার পরিবর্তে আরবি বর্ণমালায় বাংলা লেখা হলো? এ প্রশ্নের উত্তরে থিবো বলেন, এই কালপর্বে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল মুসলিম শাসকদের হাতে। শাসকবর্গ নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে এটি করতে পারেন। এছাড়া আরবি অক্ষরের লিখনরীতি সংস্কৃতের তুলনায় অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত। আরবি অক্ষরের ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সক্ষমতা, বিরামচিহ্নের ব্যবহার, কিংবা ব্যাকরণের নিয়মাবলি ইত্যাদি কারণে আরবি অক্ষর লিপিকরদের পছন্দ। এ পাণ্ডুলিপিগুলির প্রায়োগিক দিক ছিল; এগুলি ছিল পারফরমেন্সের অংশ। পাঠক উচ্চস্বরে পড়তেন এবং শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শুনতেন। স্বরধ্বনির উঠা-নামা, দীর্ঘ কিংবা হ্রাসকৃতরূপের মাপকাঠি আরবি লিখনরীতিতে বিদ্যমান, যা বাংলা বা ভারতীয় লিখনরীতিতে নেই। অনুলিপিকার কিংবা রচয়িতারা এ বিষয়টিকেও বিবেচনা করতেন। উল্লেখ্য, আরবি বর্ণমালায় কিছু ধ্বনির বহিঃপ্রকাশ নেই। বাংলায় 'প' কিংবা 'চ' বর্ণের ধ্বনিরূপ বা প্রতিবর্ণীকরণ আরবি বর্ণমালায় দেখা যায় না। এর উত্তরণ সম্ভব হয়েছে ফারসি বর্ণমালাকে যুগলবন্দি করে আরবি-ফারসি উভয় বর্ণমালা ব্যবহারের মাধ্যমে (দুবের, ২০২০, ১৪৫১-৫৬)। থিবোর ব্যাখ্যা অত্যন্ত যৌক্তিক হলেও প্রশ্ন রয়েই যায় যে, লিখনরীতির কত শতাংশ ফারসি? কোন কোন শব্দের ক্ষেত্রে ফারসি লিপির ব্যবহার বেশি? আরবি ব্যাকরণের প্রাধান্য মেনে নিলেও ফারসি বর্ণমালার পাশাপাশি কতটুকু ফারসি ব্যাকরণ নেওয়া হয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তর এখনো অজানা।

২) নসরুল্লাহ খোন্দকার রচিত *শরীয়ত-নামা*

আরবি-ফারসি বর্ণমালায় বাংলা পাণ্ডুলিপি প্রথম সম্পাদনা করেছেন ইতিহাসবিদ আবদুল করিম। অর্ধশতাব্দী-কাল আগে (১৯৭৪ সাল) তিনি কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার রচিত *শরীয়ত-নামা* কাব্যগ্রন্থটির পাঠ ও সম্পাদনা প্রকাশ করেছিলেন প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সম্পাদিত সাহিত্যবিষয়ক গবেষণা পত্রিকা *পাণ্ডুলিপি*'র ৪র্থ সংখ্যায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত (২৫৪ নং) পাণ্ডুলিপিটিকে সম্পাদক আদর্শ পাণ্ডুলিপি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার ৬ নং ইউনিয়নের পোমরা গ্রামনিবাসী জানে আলী পাণ্ডুলিপিটির লিপিকার। আরবি নাসখ রীতির হরফে লিখিত এ পাণ্ডুলিপিটি অনুলিপি করা হয়েছিল দেশি কাগজে এবং ব্যবহার করা হয়েছিল দেশি কালি। অত্যন্ত সুন্দর হাতের লেখায় অনুলিপি করা পাণ্ডুলিপিটির প্রত্যেকটি হরফে *এরাব* (জের, জবর, পেশ, সাকিন ও তাশদিদ) দেওয়া আছে এবং এর ফলে সম্পাদকের পাঠোদ্ধার করা সহজ হয়েছিল। পাণ্ডুলিপিটির প্রত্যেক ফোলিও দৈর্ঘ্যে এগারো ইঞ্চি এবং প্রস্থে সাত ইঞ্চি, এবং অনুলিপি বা লেখা হয়েছে দৈর্ঘ্যে সাড়ে সাত ইঞ্চি এবং প্রস্থে চার ইঞ্চি। ফোলিওর উভয় দিকেই (মুখ্য ও গৌণ) ১১ লাইনে অনুলিপি করা রয়েছে এবং শ্লোকের সংখ্যা ২০৭৬ (করিম, ১৯৭৪, পৃ. ১৫৫-৫৬)।

লিপিকর বাংলা অক্ষরে লেখা একটি পাণ্ডুলিপির কপি দেখে আরবি অক্ষরের পাণ্ডুলিপিটি নকল করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তের সমর্থন কবির লেখনীতেই: 'কন হরফে কন লফজ ন বুঝি এ অর্থ/বাংলা

অক্ষর হেরি আরবীয় পুস্তক।' পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন ফোলিওতে আধুনিক বাংলা অক্ষরে এলোমেলোভাবে নিম্নোক্ত নামগুলি লেখা রয়েছে:

> ক) ২০ নং ফোলিওর মুখ্য পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে 'শ্রী ছৈয়দ আমদ পীং সৈয়দ আলীমদ্দিন';
>
> খ) ৩৩ নং ফোলিওর গৌণ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে 'শ্রী সৈয়দ আলীমদ্দিন পীং সৈয়দ আমিরওদ্দিন সাং পোঁরা পোড়াঙজনা পরকস সহরকিলী'।

রাঙ্গুনিয়া থানার কাউখালী গ্রামের কালা মিয়া পীং করম আলীর কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিটি সংগ্রহ করেছিলেন পটিয়া থানার হুলাইন গ্রামস্থ আবদুচ্ছাত্তার মাস্টার। এই সংগ্রাহক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো অসংখ্য বাংলা ও ফারসি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। পাণ্ডুলিপিটির ২৪ নং ফোলিওর উপরে উল্টো করে লেখা '১২১৪ মঘীর ১৭ই মাঘ'। এছাড়া পাণ্ডুলিপিটির সাথে *রাগমালার* একটি কপি বাঁধাই করা আছে। এ পাণ্ডুলিপিটিও অনুলিপি করা হয়েছিল ১২১৪ মঘী সালে। আবদুল করিমের মতে, উভয় পাণ্ডুলিপির অনুলিপিকার এবং কাল একই; আর তা হলো ১২১৪ মঘী বা ১৮৫২ সাল।

শরীয়ত-নামার বিষয়বস্তু শরিয়া (ইসলামি আইন) অনুসারে *আমর-নেহি* (করণীয়-নিষিদ্ধ)। প্রচলিত চারটি মাজহাবের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা প্রদত্ত কিছু বিধি এ কাব্যে তুলে ধরা হয়েছে। পুথি রচনার রীতি অনুযায়ী ভণিতাংশের পরেই নামাজের বৈশিষ্ট্য, নামাজে অবশ্য-করণীয় ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এরপরই কবি সমাজে প্রচলিত কিছু কুসংস্কার নিয়ে আলোচনা করে সেগুলি বর্জন করতে বলেছেন। এর মধ্যে রয়েছে: গোবর দিয়ে ঘর লেপা, কুমারী মেয়ের 'নব পুষ্পকালে' ঢোল বাজানো, গান গাওয়া ইত্যাদি। এর পরের বর্ণনাটি নারীদের মাসিক অবস্থায় কী কী কাজ করা যাবে এবং কী কী যাবে না সে বিষয়ক। নারীর পর্দা আদায়ের বিষয়টিও কবি দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিমালায় তুলে ধরেছেন। মানুষের মৃত্যু, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের করণীয়, কাফন দেওয়া ও খাটিয়ায় তোলা, কবরে সমাহিত করার নিয়ম, ফাতেহা পড়া ইত্যাদি তুলে ধরা হয়। সমাজে প্রচলিত নানা ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডনপূর্বক কবি রোজা রাখার নিয়ম, কাজা রোজার কায়দা, তারাবি পড়া, রোজা ভঙ্গের কারণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ বর্ণনাপূর্বক মূর্খ মাওলানাদের ভণ্ডামি সম্পর্কে সতর্ক করে কাব্যটি শেষ করেন (করিম, ১৯৭৪, পৃ. ২০৭-৯১)।

৩) কবি শেরবাজ খান রচিত *ফাতেমার সুরতনামা*

কোভিড অতিমারির ঠিক আগের মাসে কবি শেরবাজ খানের *ফাতেমার সুরতনামা* কাব্যটি গ্রন্থাকারে (হাসান, ২০২০) প্রকাশিত হয়েছিল।[২] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাঁচটি পুথির মধ্যে সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহকৃত ৩০২ সংখ্যক পুথিটি আরবি-ফারসি হরফে লেখা। ৩০৪ নং পাণ্ডুলিপির অনুলিপিকাল লেখা আছে ১১৯৬ মঘী বা ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দ (Karim & Sharif, 1960, p. 309-10)। আরবি-ফারসি হরফে লেখা পাণ্ডুলিপির ফোলিও সংখ্যা একুশটি যা প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে সর্বাধিক। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এটি ছাড়া অন্য কোনো পাণ্ডুলিপিতে ভণিতাসহ কাব্যটির পূর্ণাঙ্গরূপ পাওয়া যায়নি।[৩]

কবি শেরবাজ হামদ (আল্লাহর প্রশংসা) ও নাতের (রসুলের প্রশংসা) মাধ্যমে তাঁর কাব্য শুরু করেন। এ কাব্য রচনার উদ্দেশ্য হলো রাসুল (স.)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-এর রূপ ও সৌন্দর্যের বিবরণ উপস্থাপন। ফাতেমার স্বামী হজরত আলি (রা.) হজরত আবু বকর (রা.)-এর ঘরে গিয়ে তাঁকে

ডাক দিলেন। ঘরের ভিতর থেকে আবু বকর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, কে তাঁকে ডাকছেন? আলি (রা.) উত্তর দিলেন, আমি আলি। আপনি বাইরে এসে আমার সাথে দেখা করুন। দরজায় এসে আবু বকর (রা.) আলি (রা.)-কে প্রশ্ন করেন, কে তুমি? উত্তরে আলি (রা.) বললেন, আমাকে চিনতে পারলেন না? আমি রসুলের 'দামাদ', হাসান-হোসেনের পিতা এবং ফাতেমা (রা.) অপরূপা আমার স্ত্রী। আবু বকর (রা.) মৃদু হেসে আলিকে বললেন 'তুমি কি ফাতেমার সুরত দেখেছ?' আলি (রা.) অবাক হয়ে আবু বকরকে উত্তর দেন, 'কী অবাক কথা!' ফাতেমা (রা.) 'আমার ঘরনি'! আমি যদি ফাতেমা (রা.)-এর সুরত না দেখি তাহলে আমার দুই পুত্র হলো কীভাবে? তার আর কী সুরত আছে যা আমি জানি না? তখন আবু বকর (রা.) উত্তর দিলো:

এসব সুরত তান দিআছে আল্লাহএ।
ছাপায়ে রাখিছে জান বিবি ফাতেমায়।
কভু তুমি না দেখিছ ফাতেমার রূপ।
রাখিছে সুরত মাএ বেহেস্তের কুলুব।
প্রচার করিবে মাএ হিসাবের দিন।
সুরাতের কথা মায়ের হাসানসেজান।

(ফোলিও নং ০২, গৌণ পৃষ্ঠা, পুথি নং ৩৬৩)

লজ্জায় হজরত আলি ঘরে ফিরে খাটের উপর শুয়ে পড়েন। বিবি ফাতেমা খাবার রান্না করে খাওয়ার জন্য ডাক দিলেন। কিন্তু আলি ফাতেমাকে বলেন তোমার সৌন্দর্য না দেখা পর্যন্ত আমি কোনো কিছু খাব না। উত্তরে ফাতেমা বলেন, আমি তো আপনার সাথেই সবসময় থাকি। আমার যা আছে সেটা তো আপনার দেখা। এ কী কাহিনি বলছেন আপনি। আমার আর কী সুরত আছে? কিন্তু আলি আবার ফাতেমাকে বলেন, তোমার যে নিজ রূপ আছে তা আমি দেখতে চাই। শুনে ফাতেমা চলে গেলেন। তিনি দুই ছেলে হাসান-হোসেনকে পাঠালেন হযরত আলিকে আনার জন্য। দুই ছেলে এসে বাবার কোলে বসে বাবাকে বলল— বাবা, তোমাকে চিন্তিত লাগছে কেন? সত্য করে আমাদের কাছে বল কী হয়েছে? আলি উত্তর দিলেন, বাছা খবর শোন। তোমাদের মায়ের আরও রূপ আছে। হাসান-হোসেন উত্তরে বলল, হ্যাঁ, পবিত্র কোরানে তা বলা আছে। এটা তিনি কিয়ামতের দিন প্রকাশ করবেন। এ কথা শুনে আলি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন এবং ফাতেমার সুরত দেখার জন্য ব্যাকুল হলেন।

তিন দিন যাবৎ আলি খাবার বা পানি কিছুই খান না। ফাতেমার সুরত দেখার জন্য তাঁর হৃদয় অস্থির। ফাতেমা ব্যাকুল চিত্তে আলিকে গিয়ে বললেন, তিন দিন ধরে আপনি খাবার খাননি, তাই আপনার দুই ছেলেও কোনো কিছু খায়নি। আলি উত্তর দেন যে তিনি ফাতেমার সুরত দেখার পরেই খাবার খাবেন। ফাতেমা দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে বললেন, যে ব্যক্তি আপনাকে আমার সুরতের খবর দিয়েছে তার ওপর হোক 'জওহর-কওহর'। ফাতেমার মুখে এ কথা শোনার সাথে সাথে আল্লাহ ফেরেশতা জিব্রাইল (আ.)-কে বললেন, 'দেখ ফাতেমা হাসান-হোসেনকে বধিলেন।' নিরুপায় ফাতেমা আলিকে মৃগয়াতে যেতে বললেন। বললেন, অরণ্যের মধ্যেই তিনি সুরত দেখতে পারবেন। ফাতেমার কথায় আলি শিকারে চললেন। সেখানে আলি বিভিন্ন দৃশ্যকল্প বা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন। সেগুলি হলো:

প্রথম দৃশ্যকল্পঃ একজন নামাজরত ফকিরের পাশে দুইজন বালককে নিয়ে এক কঙ্কালিনী দাঁড়িয়ে আছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যকল্পঃ আলি প্রখর সূর্যতাপে জঙ্গলের ভিতর চলছেন। একটি মাঠের মধ্যে গাছের নিচে একজন ফকির সিজদারত। ফকিরের দুই চোখ বেয়ে অশ্রু বের হয়ে আসছে। এখানেও ফকিরের পাশে কঙ্কালিনী দাঁড়িয়ে বাবা-বাবা বলে ডাকছে। ফকির উম্মত উম্মত বলে ক্রন্দনরত এবং তাঁর অশ্রুতে জমিন ভিজে যাচ্ছে।

তৃতীয় দৃশ্যকল্পঃ আলি সামনে অগ্রসর হতে থাকে। তৃতীয় দৃশ্যকল্পে আলি দেখেন জনৈক ফকির আগুনের মাঝখানে বসে আল্লাহর জিকির করছেন। প্রচণ্ড তাপে ফকিরের মাথার মগজ এমনভাবে ফুটছে, যেভাবে আগুনের তাপে হাড়ির চাল সিদ্ধ হয়। ফকিরের মাথার খুলি ফেটে মগজ বের হয়, তা সত্ত্বেও তিনি উম্মত-উম্মত বলে ক্রন্দনরত।

চতুর্থ দৃশ্যকল্পঃ আলি চিন্তিত হয়ে সামনে গিয়ে দেখেন একজন কঙ্কালিনী রুটি বানাচ্ছে। আলি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে? কার স্ত্রী তুমি? জঙ্গলে বসে কার জন্য রুটি বানাচ্ছ? কঙ্কালিনী উত্তর দেয়, আমি আমার নিরঞ্জনের জন্য রুটি তৈরি করছি।

পঞ্চম দৃশ্যকল্পঃ ইমাম আলি বনের মাঝে অগ্রসর হতে থাকেন। হঠাৎ তিনি গাছের উপর একটি ময়না পাখি দেখেন, যার মাথায় তাজ, গলায় হাঁসুলি, ললাটের মাঝে সবুজ টিকলি ও দুই কানে দুই মতি পরা। ময়নার শরীরে পবিত্র আল কোরানের অক্ষর লেখা। ময়নার মুখে আল্লাহর জিকির ও কালেমা। ময়নার 'রূপে আলি মোহিত' হয়ে তাকে ধরতে যায়। ময়নার কাছে গিয়ে আলি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেলে ময়না হেসে উড়ে যায়। এভাবে ময়না একডাল থেকে আরেক ডালে উড়তে থাকে। ময়না এভাবে তামাশা করতে থাকে। আলিকে রেখে ময়না উড়ে চলে। ময়না উড়ে যায় সমুদ্রের পানে। আলিও তার পিছনে সাঁতার দিলেন। ময়না মনে মনে ভাবে, একি করছি আমি। আমার জন্য কেন একজন দুঃখ পাবে? এজন্য আমি গুনাহগার হব। এই ভাবনায় ময়না তীরের দিকে ফিরতে শুরু করলে আলিও তার পিছন পিছন সাঁতার কেটে তটে ফিরে আসেন।

ষষ্ঠ দৃশ্যকল্পঃ তীরে ফিরে আলি সুন্দরী ময়নাকে ধরতে যায়। ময়না কিছু দূরে গিয়ে এক মসজিদের ভিতর প্রবেশ করে। ময়নার পিছনে পিছনে আলি মসজিদের নিকটে উপস্থিত হয়ে মসজিদের দরজায় খাটুলিতে শয়নরত একজন বৃদ্ধ নারীকে দেখেন। আলি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মসজিদের ভেতর একটি ময়নাকে যেতে দেখেছ? উত্তরে বৃদ্ধা বলেন হ্যাঁ, একটি ময়নাকে যেতে দেখেছি। আলি বৃদ্ধাকে দরজা থেকে সরতে বললেন। বৃদ্ধা বলল, আমার নড়ার শক্তি নেই। আমাকে উঠিয়ে একপাশে রেখে মসজিদের ভিতর গিয়ে তুমি ময়না দেখ। আলি অনেক টানাটানি করেও ব্যর্থ হন। বৃদ্ধা আলিকে বলে, জগতের সকলে তোমাকে 'মহাবলী' বলে, কিন্তু তোমার 'মরদামি' আমি বুঝতে পারলাম। বৃদ্ধা আলিকে খাটুলির নিচ দিয়ে মসজিদের ভিতর দেখার জন্য বলেন। আলি মসজিদের ভিতর আরশ-কুরসি দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন মসজিদের ভিতর দুইজন বালক কোরান পড়ছে এবং তাদের একজনের মুখ কালো এবং অন্যজনের মুখ লাল হয়ে আছে। আলির মনে এই দুই আদম সন্তানের পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। আলি বৃদ্ধার পরিচয় জানতে চাইলে বৃদ্ধা আলিকে পাল্টা প্রশ্ন করে কেন হুজ্জত করেছিলে তুমি? কেন তুমি ফাতেমার সুরত দেখতে চাইলে? এই জঙ্গলে যা দেখলে সবই

আল্লাহর ইচ্ছা। হজরত আলি তার দেখা বিষয়াদির অর্থ *ইলমে মারেফত* ভেবে আল্লাহর নাম জিকির করতে করতে ঘরে ফিরে গেলেন।

আলি ঘরে ফিরলে ফাতেমার সাথে দেখা হয়। ফাতেমা আলিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বনে কী দেখেছেন? কী শুনেছেন? কীসের সাক্ষাৎ পেলেন? আলি উত্তর দিলো, আগে আমাকে সুরত দেখাও। ফাতেমা একে একে সকল বিষয় হযরত আলির কাছে তুলে ধরে বলেন,

প্রথমত, আপনি বনে যখন গিয়েছেন তখন আমিও আপনার সাথে গিয়েছিলাম। বনে দেখা ফকির ছিলেন রসুল (স.)। কঙ্কালিনী আমি এবং আমার সাথে ছিল হাসান-হোসেন।

দ্বিতীয়ত, রাসুল (স.) তাঁর উম্মতের পানাহ চেয়ে নামাজ পড়ে কাঁদছিলেন।

তৃতীয়ত, হাশরের ময়দানে মাথার উপর যখন সূর্য থাকবে তখন রাসুল (স.) তাঁর উম্মতের পানাহ চেয়ে কাঁদবেন।

চতুর্থত, জঙ্গলের কিনারে রুটি বানিয়েছে যে কঙ্কালিনী তিনি হলেন ফাতেমা স্বয়ং। ফাতেমাই আলির জন্য রুটি বানাচ্ছিলেন এবং আলিই ফাতেমার একমাত্র নিরঞ্জন।

পঞ্চমত, জঙ্গলে যে ময়না আলি দেখেছে সেটি হজরত ফাতেমা। তিনি ময়না হয়ে জঙ্গলে গিয়েছিলেন। ময়নার শিরের তাজ হলো প্রভু-করতার। 'গলার হাঁসুলি ছিল দ্বীন-রসূল'। ময়নার দুই কানের মতি হলো হাসান-হোসাইন। ময়নার কপালের টিকলি হযরত আলি।

ষষ্ঠত, ফাতেমাই বৃদ্ধার রূপ ধারণ করে মসজিদের দরজায় গিয়েছিলেন। আলি তখন ফাতেমাকে প্রশ্ন করলেন, তাহলে আমি তোমাকে তুলতে পারলাম না কেন? ফাতেমা বললেন, ত্রি-ভুবনের আঠারো হাজার মাখলুকাত আমার ওপর ভর করেছিল। তুমি কীভাবে তুলবে? মসজিদের ভিতর কোরান তেলাওয়াতরত দুই বালকের কথা শুনে ফাতেমা পুত্র পুত্র বলে কাঁদতে লাগলেন। হায় হায় করে বুক চাপড়ায়ে বলতে লাগলেন, কেন আমি এই মুখে জহর-কহর বলে গালি দিয়েছিলাম?

কিছুক্ষণ পর শান্ত হয়ে ফাতেমা আলিকে রুটি খেতে অনুরোধ করেন। আলি আবার বলেন, আগে সুরত দেখাও। ফাতেমা উত্তর দিলেন, আর কেমন সুরত দেখবে? কঙ্কালিনী, ময়নাবতী এবং বৃদ্ধা রূপে আমি গিয়েছিলাম। এসবই আমার সুরত। আলি বলেন, এসব কথা আমি শুনব না তোমার সকল সুরত দেখেই আমি খাবার খাব। ফাতেমা আলির কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। ফাতেমা রাসুল (স.)-এর কাছে গিয়ে এ ঘটনা বললেন। রাসুল (স.) আলির কাছে এসে বললেন, আল্লাহ স্বয়ং ফাতেমাকে সুরত দিয়েছেন এবং তা ইলমে বাতেন, যা কেবল কিয়ামতের দিন প্রকাশিতব্য। যদি তুমি সেই সুরত দেখ তাহলে তার জ্যোতিতে তুমি জ্বলে যাবে; জ্বলে যাবে আরশ কুরসি, ত্রিভুবন, তোমার দুই 'ফরজন' হাসান-হোসেন।

আলি উত্তর দিলেন, যদি মৃত্যুবরণ করি তাও আমি ফাতেমার সুরত দেখব। হাসান-হোসেন দুই ভাইও পিতাকে বোঝাতে লাগল। মায়ের সুরতের জ্যোতি তারা সহ্য করতে পারবে না। সেই জ্যোতিতে তারা দুই ভাই পুড়ে যাবে। আল্লাহর কাছে মা কী উত্তর দিবে। তারা বারবার বাবাকে 'হুজ্জত' করতে নিষেধ করল (পুথি নং ৩৬৩: ফোলিও নং ২১, মুখ্য ও গৌণ পৃষ্ঠা)।[৪] হাসান-হোসেনের অনুরোধ সত্ত্বেও আলি

ফাতেমার সুরত দেখার জিদ বজায় রাখেন। ফাতেমা আলিকে সতর্ক করেন যে সুরতের জ্যোতিতে তার মৃত্যুবরণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। 'অলি-আল্লাহর দোহাই' দিয়ে সুরত দেখানোর জন্য ফাতেমাকে অনুরোধ করে। ফাতেমা পেরেশান হয়ে রসুলের কাছে যায়। এ-সময় ফাতেমা বলেন, সুরত দেখানোর জন্য যদি 'মাজার তিন বন্ধ' খোলে তাহলে সাথে সাথে তিনি 'মুহচিত' হয়ে যাবেন।[৫] কবির ভাষায়:

তবে সে ফাতেমা বিবি হইআ পেরসানি
নবির গেচরে জাই কহে স বানি
জখনে মাজা বন্ধ খুলিতে লাগিমু
এক বন্ধ খুলি দুই বন্ধ খুলিমু
তিন বন্ধ খুলিতে যে মুহুচিত হইমু।
(পুথি নং ৩০৩, ফোলিও নং ১৩)

ফাতেমা বিসমিল্লাহ বলে এক বন্ধ খুলে ফেললেন। সাথে সাথে বিজলি চমকে উঠল। ফাতেমা আলিকে অনুরোধ করলেন, এবার আমায় ক্ষমা কর। আলি উত্তরে বললেন, আমি কিছুই শুনব না। আমি তোমার সুরত দেখব। দুই বন্ধ খোলার পর বিজলি চমকে উঠল। ফাতেমা আবার আলির কাছে নিবেদন করেন। আলি নাছোড়বান্দা। ফাতেমা ক্রোধে তিন বন্ধ খুলে ফেললেন। চারদিকে তখন আগুনের মতো বিজলি চমকালো। ফাতেমার সুরত দেখে আলি টলে পড়লেন। হাসান-হোসেন দুই ভাইকে ডাকতে লাগলেন। রাসুল (স.) মুহচিত হয়ে পড়লেন। অতঃপর রাসুল উঠে বসলেন। মা মা বলে তিনবার ডাক দিলেন। বাবার ডাক শুনে কন্যা ফাতেমার চেতনা ফিরে আসল। নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেলেন। সাথে সাথে জামা বেঁধে নিলেন। দেখলেন 'হাসান-হোসেন মূর্ছা' গেছেন। 'আলি পড়ে আছে। রসুল হতচকিত' হয়ে আছেন। ফাতেমা ভাবতে থাকলেন, কী করবেন তিনি? কার যত্ন নেবেন আগে? প্রথমে তিনি পিতার মুখ ধুয়ে দিলেন। তারপর স্বামী আলিকে শান্ত করলেন। সবশেষে দুই ছেলে হাসান-হোসেনকে ... (পুঁথি নং ৩০৩)।[৬] আলি সুরত দেখে সন্তুষ্ট হলেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া করে নামাজ পড়লেন।

৪) মোহাম্মদ শফি রচিত *নুরনামা*

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থিবো দুবের *Meaningful Rituals Persian, Arabic, and Bengali in the Nurnama Tradition of Eastern Bengal* গ্রন্থটিতে তিনটি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'নুরে-মোহাম্মদি'কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সাহিত্য গবেষক-মহলে উপস্থাপন করেছেন। পাণ্ডুলিপি তিনটি হলো: **ক**) প্যারিসের বিবলিওথিক ন্যাশনালে সংরক্ষিত অজ্ঞাত লেখকের ফারসি ভাষায় রচিত *নুরনামা*, **খ**) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত চট্টগ্রামের কবি আবদুল হাকিম রচিত *নুরনামা* (আনুমানিক ১৬৬০ সা. অব্দ) এবং **গ**) বাংলা একাডেমিতে সংরক্ষিত মোহাম্মদ শফি রচিত আরবি অক্ষরে বাংলা ভাষায় লেখা *নুরনামা*। গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথমে আরবি হরফকে রোমান হরফে প্রতিবর্ণীকরণ করে মোহাম্মদ শফির *নুরনামা* পাঠোদ্ধার এবং তার ইংরেজি অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। মোহাম্মদ শফির *নুরনামা* হচ্ছে 'esoteric' বা গূঢ় সাহিত্য, যা গুরু বা আধ্যাত্মিক নেতার উপস্থিতিতে পাঠ করা হতো। থিবোর অনুমান, মোহাম্মদ শফি সৈয়দ সুলতানের শিষ্য বা আত্মীয়। কবি সৈয়দ সুলতান ছিলেন বাংলা ভাষায় এ সাহিত্যধারার অগ্রপথিক। যোগ বা

সাধন-সাহিত্যে স্থানীয় রীতির মাধ্যমে সুফিরা ধর্মবচন প্রচার করতেন। বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আরবি সাহিত্যের *দাকায়েকুল আখবার* এবং ফারসি *নুরনামা* অনুসরণে এই রীতির বিকাশ। এর কেন্দ্রীয় বিষয় হজরত মুহাম্মদ (স.) এবং বিশ্বজগতের সৃষ্টিনামা। *নুরনামায়* সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টির মৌলিক চারটি উপাদান পানি, আগুন, বায়ু ও মাটি (সৃষ্টির আদি উপাদান) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। *নুরনামা*কে বলা হয়েছে সকল কিতাবের আদি উৎস। আবদুল হাকিমের মতে, *নুরনামা* পাঠকারীদের দেওয়া হবে শহিদের থেকেও অধিক মর্যাদা এবং মৃত্যুর পরে তাঁর জন্য জান্নাতের দরজা খুলে যাবে। *নুরনামার* পাঠক-মুমিনদের আল্লাহ খারাপ মানুষদের জবান এবং প্রতারণা থেকে রক্ষা করবেন। এছাড়া আল্লাহ তাঁদেরকে জাদুকরের জাদুটোনা ও ভূমিকম্পসহ সকল প্রকার আসমানি ও দুনিয়াবি বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা করবেন। যারা *নুরনামা* পড়তে পারে না (নিরক্ষর) কিন্তু পাঠ শুনবে, তারাও একই রকম ফজিলত ভোগ করবেন। *নুরনামা* পাঠকারী ও সংরক্ষণকারী এবং সৃষ্টিকর্তার মধ্যে কোনো পর্দা বা মাধ্যম থাকবে না। রবিবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার সন্ধ্যায় *নুরনামা* পাঠ করলে আল্লাহর কাছে যা চাওয়া হয় তাই পাওয়া যায়। এ ধরনের রচনার প্রথমে থাকত *হামদ* ও *নাত* এবং তারপর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা। মধ্যযুগে বাংলায় এ রীতিতে সাহিত্য রচিত হয়েছে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত– চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে (d'Hubert, 2022, p. 9-10, 50-56, 46-124)।

৫) আরবি-ফারসি অক্ষরে বাংলা লিখন-রীতি: বহুমাত্রিকতার স্বরূপ অনুসন্ধান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত আরবি-ফারসি বর্ণমালায় অনুলিপিকৃত কয়েকটি বাংলা পুথির উপস্থাপনগত বৈশিষ্ট্য এবং এগুলির বহুমাত্রিকতা সংক্রান্ত কিছু প্রস্তাবনা নিচে তুলে ধরা হলো:

আবদুল করিম এবং আহমদ শরীফ রচিত *A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts in Munshi Abdul Karim's Collection* গ্রন্থে নথিভুক্ত ১২৪-১২৫ নং (সা. বি. ৩ ও ৪) পাণ্ডুলিপির লেখক অজানা এবং শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল *সকিনার বিলাপ* (Karim & Sharif, 1960, p. 132)। পাঠোদ্ধারকৃত পাণ্ডুলিপিতে লিপিকারের নাম উল্লেখ থাকলেও ভণিতা ও সমাপনী অংশে রচয়িতার নাম অনুপস্থিত। পাণ্ডুলিপিটির অনুলিপিকার সম্ভবত এই রীতিতে অনুলিপির কাজে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কেননা আরবি-ফারসি অক্ষরে লেখা পাণ্ডুলিপিতে অক্ষর কাটা বা অক্ষর পরিত্যক্তের কোনো চিহ্নও নেই। পাণ্ডুলিপির শেষে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী 'ওয়াজউদ্দিন পীছরে আফতাবউদ্দিন' এটির অনুলিপি করেছিলেন। লিপিকরের 'সাকিন নোয়াপাড়া'। সাহিত্যবিশারদের সংগৃহীত অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম জেলা এবং ভারতের ত্রিপুরা থেকে প্রাপ্ত। এই তথ্য বিবেচনায় আলোচ্য পাণ্ডুলিপিটির লিপিকরের সাকিন এখনকার চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাইয়ের নোয়াপাড়া হওয়ারই সম্ভাবনা প্রবল। দশ ফোলিওর এ পাণ্ডুলিপির প্রতিটির উভয় দিকেই আরবি-ফারসি অক্ষরে বাংলা ভাষায় কারবালার শহিদ কাসেমের বিবি সকিনার হাহাকার তুলে ধরা হয়েছে। কারবালার প্রান্তরে কাশেমের সাথে সকিনার বিয়ে হয় এবং বর বিয়ের পরপরই শাহাদাত বরণ করেন।

কারবালার প্রান্তরে যুদ্ধের দামামা চলছে; শত্রু-নিনাদে প্রকম্পিত কারবালার ময়দান। ফোরাত নদী শত্রুর কব্জায়। তৃষ্ণার্তের আহাজারিতে কারবালার আকাশ বাতাস ভারী হয়ে আছে। হযরত আলি

(রা.)-এর পরিবারের অনেক সদস্য বীরবেশে লড়াই করে শহিদ হয়েছেন। পিতৃব্য হোসেন (রা.)-এর সম্মান রক্ষায় রণাঙ্গনে বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তে নববিবংশের প্রদীপ কাসিম রণসাজে প্রস্তুত। এ শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতেও হজরত হোসেন স্বীয় অগ্রজ হাসানের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষার তাগিদে কাসিম ও সকিনার বিবাহের বন্দোবস্ত করলেন। একদিকে রণভেরির ভীষণ শব্দ, আরেকদিকে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বিয়ের আয়োজন। নব্য বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর একান্তে মধুর মিলন কিংবা বাসরসজ্জায় নিরালায় কিছু সময়যাপনের সুযোগ কোথায়?

নববধূ সকিনার হৃদয়রাজ্যে পতি-বিচ্ছেদের বেদনার ঢেউ। সকিনা বিনয়াবনত চিত্তে প্রাণপতি কাসিমের কাছে মিনতি করলেন, যদি যেতেই হয় যুদ্ধে তবে সঙ্গে করে তাকেও যেন নিয়ে যায়। স্বামী উত্তরে বলেন, রণাঙ্গন প্রস্তুত, আমাকে বিদায় কর। যদি যুদ্ধে প্রাণ থাকে তবে ফিরে তোমার দেখা পাব; আর যদি রণাঙ্গনে জীবন চলে যায় তবে স্বর্গে হবে মধুর মিলন। নববধূ সকিনা অস্থির হয়ে ভাই আলি আকবরকে অনুনয় করে বলেন: 'আলী আকবর ভাই, সত্য করে বল, পরাণপতির কী উপায় হবে বল' (ফোলিও ৩, মুখ্য পৃষ্ঠা, পুথি নং ১২৪)। আলি আকবর নীরব থাকেন। ভাইয়ের নির্লিপ্ততায় 'মা মা' চিৎকারে ক্রন্দনে ফেটে পড়েন সকিনা বিবি এবং বলতে থাকেন, এ যন্ত্রণা কী করে সইব আমি? এর চেয়ে বরং আগুনের মাঝে ঝাঁপ দেব। নববধূর বিলাপে শোকাবহ পরিবেশে আরো শোকের ছায়া নেমে আসে। ক্রন্দনরত সকিনার শিওরে আসেন কাসিম। স্বামী কাসিমকে কাছে পেয়ে সকিনা যেন জীবন ফিরে পেল। আকাশের চাঁদ এখন তার হাতে। প্রিয় স্বামীর কাছে বারবার মিনতি করে বলেন, 'অভাগিনীরে নিরাশ করো না গো প্রাণপতি। আমার মনকে শান্ত কর গো আমার অধিপতি' (ফোলিও ৪, মুখ্য পৃষ্ঠা, পুথি নং ১২৪)।

স্ত্রীর মিনতিতে মহাবীর কাসিম কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েন। যুদ্ধের দামামা বেজেই চলছে; সেখানে আজ বিলাপের সময় নেই। কাসিম সকিনাকে জড়িয়ে ধরে এবং হাতে চুমো দিয়ে বলে, আমি যুদ্ধে চললাম। সকিনার অশ্রুতে কাসিমের শরীর ভিজে যায়। কাসিম যুদ্ধে চললেন। সকিনার মন মানে না (ফোলিও ৫, গৌণ পৃষ্ঠা, পুথি ১২৪)। সকিনার শোকার্ত বিলাপ ইথারে ইথারে ভেসে চলে কারবালার প্রান্তরে। কারবালার বাতাসে মিশে যায় পতি-বিচ্ছেদের করুণ আকুতি। কাসিমের অশ্বধ্বনি ধীরে ধীরে মিলে যায় দৃষ্টির আড়ালে। সকিনার বিলাপ-ধ্বনি ক্রমশ বাড়তে থাকে। ধুলায় লুটিয়ে পড়ে তার দেহখানি। ভেঙে যায় সকিনার পায়ের নূপুর; অঙ্গসজ্জাহীন হয়ে ধুলায় লুটিয়ে এলোকেশে কন্যা পিতা-ভ্রাতার কাছে অনুযোগ তোলেন (ফোলিও ৭, গৌণ পৃষ্ঠা; ফোলিও ৮, মুখ্য পৃষ্ঠা, পুথি ১২৪)।

সকিনার ক্রন্দন রোলে বনের পশুপাখিও শোকে কাতর হয়ে পড়ে। কারবালার আকাশে কালো মেঘের ঘনছায়া নিকষ কালো হয়ে ঘনীভূত হয়ে যায়। পিপাসার্ত নারী-শিশুর আর্তনাদ আর কান্নার রোল সাত আসমান ভেদ করে চলে যায় ঊর্ধ্বলোকে। আসমানেও যেন নেমে এসেছে নিকষ কালো বিষাদের ছায়া। রণাঙ্গন থেকে কাসিমের শাহাদাতের সংবাদ আসে। কাসিমের নিথর দেহ তার মায়ের কোলে আনা হয়। পুত্রের মৃতদেহ দেখে মায়ের হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়ে। হোসেনের শিবিরে কান্নার রোল পড়ে যায়। হযরত আলির (রা.) পরিবারের রমণীরা পুত্রশোকে বিলাপ শুরু করে। শোকাতুর জননী মৃত পুত্রের মাথা কোলে নেন। প্রাণপতির রক্তাক্ত শির দেখে সকিনা কেঁদে কেঁদে বললেন, 'হা হা মোর পরাণ পতি। কেনে হইল হেন গতি। কোন পাপে করিল নিদান।' সকিনা স্বামীর দেহে লুটিয়ে পড়ে

চেতনা হারালেন। শোকবিহ্বল সকিনার চেতনা ফিরে এলে বলেন, 'যদি নিতা সঙ্গে করি পক্কি রূপ ছায়া ধরি/আমি নারী করিতুম বাতাস' (ফোলিও ৯, গৌণ পৃষ্ঠা, পুথি ১২৪)।

প্রিয় স্বামীকে হারিয়ে সকিনার জীবন বিপন্ন। পৃথিবীর যাবতীয় সুখ তার জন্য বিষাদে পরিণত হয়েছে। শোকসাগরে ভাসিয়ে তার প্রাণনাথ চলে গেছে অজানা দেশে। তিনি যোগিনী বেশে বাকিটা জীবন কাটিয়ে দেওয়ার ইরাদা করেন। তিনি রোম-শ্যাম দেশে ঘুরে বেড়াবেন। 'পরাণপতি'র কথা মনে করে পাহাড়-পর্বত-জঙ্গলে সন্ন্যাসী রূপে তার বাকি জীবন কাটবে। কবিতার ভাষায়,

প্রতি দেশে করিমু বিচার ধরিয়া যোগিনী বেশ
উড়মি চাহি নানান দেশ রোম শাম করিমু বিচার।
সন্যাসির ধরি বেশ যাবত জীবন শেষে
পরাণ পতি করিমু স্মরণ।
নাতু দুই শোকে লইয়া পাহাড়ে চড়িমু গিয়া।
হাটে ঘাটে করিমু বিচার।
(ফোলিও ১০, মুখ্য পৃষ্ঠা, পুথি ১২৪)

কবি নববধূর পতি-বিয়োগের শোক আর বৈরাগ্য গ্রহণের হাহাকার জানিয়ে *সকিনা-বিলাপ* কাব্যটির ইতি টানেন। ইরাকের ফোরাতের তীরে কষ্ট পাওয়া কন্যার আত্মা শান্তির প্রত্যাশা করে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের নানা দেশে। বৈরাগীর আত্মা হাহাকার করে কারবালার অন্যায়ের প্রতিকার চায় বাংলার 'হাটে-ঘাটে'। কবির শব্দজালে কারবালার প্রান্তরের ত্যাগ ও আত্মবলিদানের বেদনা স্ফুরিত হয় বাংলার স্থানিক পাটাতনে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত কবি সৈয়দ হামজা রচিত *আমির হামজার* একটি পুথি আরবি অক্ষরে অনুলিপিকৃত (সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহ, পুথি নং ১০)। এ পাণ্ডুলিপির প্রথম দুই ফোলিওর পর থেকে পৃথক হস্তলিপি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম দুটিতে *নাসখ* রীতি লক্ষ করা গেলেও পরের অংশগুলিতে *নাসতালিক* রীতি দেখা যায়। একই পাণ্ডুলিপিতে একাধিক রকমের লিপিরীতি বাংলা কিংবা সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতেও দেখা যায়। সম্ভবত প্রথম দুই ফোলিওর অনুলিপিকার আর কাজটি করেননি। এ কারণে নতুন কেউ পরবর্তী অংশগুলি লিখেছেন। কিন্তু কোন কারণে এটি হয়েছিল তা অনুসন্ধানের সুযোগ একেবারেই নেই। তবে এটি ইঙ্গিত করছে, বহুভাষা ও লিপিরীতিতে দক্ষ অনুলিপিকার শ্রেণির উপস্থিতি তখন সমাজে ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত ৩৬ নম্বর পুথিটি আলোচ্য রীতিতে কপিকৃত সৈয়দ সুলতানের *ইবলিশনামা*। এ পুথির শেষ তিন ফোলিওতে দেখা যায়, বাংলা অক্ষরে মূল আরবি লেখার পাশে অংকে ১, ২, ৩– এভাবে ১২ পর্যন্ত লেখা আছে। প্রতিটি অক্ষরের পার্শ্ববর্তী লাইনে বাংলায় 'পরথমে', 'দ্বিতীয়ে', 'তৃতীয়ে' এইভাবে 'দ্বাদশে' পর্যন্ত লেখা আছে। সম্ভবত একাকী পুথি পাঠ এবং জনপরিসরে পুথি উপস্থাপন বা পারফরমেন্সের সময় বিষয়গুলি বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচরে আনার জন্য পাশে অঙ্কে লিখে দেওয়া হয়েছিল। পুথির অনুলিপিকরের পাশাপাশি পাঠকও বাংলা ও আরবি উভয় লিপির সাথে পরিচিত– এ অনুমানের সমর্থন পুথিটির এ তিন ফোলিওতে মেলে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত কবি সৈয়দ সুলতানের *ওফাতে রসূল* কাব্যের একটি পাণ্ডুলিপির (নম্বর ৪৮) প্রত্যেকটি লাইনের শুরু এবং শেষে ক্ষুদ্রাকার চার বা ছয় পাপড়ি সম্বলিত চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। অঙ্কিত চিহ্নগুলি পবিত্র কোরান শরিফের আয়াত লেখার ক্ষেত্রে দেওয়া বিরতি বা সমাপ্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রতিটি আয়াতের শেষে যেমন সমাপ্তি চিহ্ন তেমনি এ পাণ্ডুলিপির প্রতিটি লাইনের শেষেও রয়েছে সমাপ্তি চিহ্ন। এটি পাণ্ডুলিপির উপস্থাপনগত সৌন্দর্যের পাশাপাশি সমাপ্তি প্রকাশের প্রতিষ্ঠিত রীতির প্রতিফলন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত *জ্ঞান-সাগর* পুথির একটি পাণ্ডুলিপির (সা. বি. ১৪৬) কয়েকটি ফোলিওতে ডান দিকের খালি জায়গায় আড়াআড়িভাবে বাংলা অক্ষরে মালিকের নাম লেখা: 'এই পুস্তকের মালিক শ্রীআবদুলকাদেরফজরআলীসাংহুসাইন থানাপটিয়াজিলাচট্টগ্রাম'। পুথির ভাষ্য এবং মালিকের নাম একই কালিতে লেখা। সাকিন উল্লেখ করতে গিয়ে 'থানা' ও 'জিলা' শব্দদ্বয় ইঙ্গিত করে যে পুথিটির মালিক উনিশ শতকের শেষ দিকের একজন ব্যক্তি।

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তগুলি বিচ্ছিন্ন এবং এক্ষেত্রে উপস্থাপিত সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজন এ জাতীয় পাণ্ডুলিপির একটি সর্বাত্মক জরিপের মাধ্যমে ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রস্তুত করা। এ বিষয়ক প্রস্তাবের উপসংহার টানাও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তবে এটি স্পষ্ট যে, দোভাষী পুথি কিংবা সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত পুথিবিষয়ক গবেষণার কেন্দ্রীয় স্রোতধারায় আরবি-ফারসি হরফে লেখা বাংলা পুথি সম্পর্কে গবেষণার উপস্থিতি অনেকটাই হঠাৎ বৃষ্টির মতো। মুসলিম-শাসনের শুরু হতেই এই রীতি প্রচলিত ছিল এটি মেনে নেওয়ার কোনো যুক্তিযুক্ত প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় না। এ রীতির কোনো পুথিকে ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ শতক কালপর্বে রচিত বলে শনাক্ত করা যায়নি। মুঘল আমলে সুবা বাংলায় এই রীতি ছিল– এ অনুমান বিবেচনা করা যেতে পারে। ১৫৬৫ সালে রাজমহলের যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে বাংলার উত্তর-পশ্চিম এলাকায় মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্বাংশসহ সমগ্র বাংলা মুঘলদের অধীনে আসে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। সেক্ষেত্রে থিবো প্রস্তাবিত কালপর্বের গ্রহণযোগ্যতা অধিক মনে হয়েছে। আরবি-ফারসি শব্দের আধিক্য এ পদ্ধতিতে পুথি কপি করার প্রক্রিয়াকে সহজ করেছিল। বহুভাষাদক্ষ গবেষক থিবো দুবেরের গবেষণার সূত্র ধরে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি, আরবি-ফারসি লিখনরীতি অনুসরণ করে সৃষ্ট এ পুথিগুলির বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, আঙ্গিক এবং পাঠক-শ্রোতা উভয়গোষ্ঠীর বহু-ভাষা দক্ষতা। এটি মানতেই হবে, বিষয়বৈচিত্র্যের কারণে এ রীতির পুথিগুলিকে শাস্ত্রকথার বা ধর্ম-পরিচয়ের তকমা লাগানো যায় না। হয়তো আরবি ভাষার ব্যাকরণের লিখিত কাঠামো এ রীতির পুথি রচনার অন্যতম কারণ। কিন্তু ফারসির বিষয়টিকেও আলাদাভাবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। মধ্যযুগের বাংলায় বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সমন্বয়ের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। হয়তো সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির এ সমন্বয়বাদী ও বহুত্ববাদী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল এভাবে পুথি অনুলিপির মাধ্যমে। পুথি-পাঠক বা পারফর্মারের বহুভাষিক দক্ষতার পাশাপাশি বাংলা পুথির বহুত্ববাদী চরিত্রকে অস্বীকার করার অবকাশ নেই। বাংলা পুথি-প্রস্তুতের ইতিহাসে এ ধরনের বহুত্ববাদী ভাবনার বিকাশকে থিবো সমসাময়িক স্থানিক (local) এবং বৈশ্বিক (global) পাটাতনে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, আবদুল হাকিম এবং মোহাম্মদ শফি উভয়েই দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ বা চট্টগ্রাম এলাকার কবি। *নুরনামা*র বেশ কিছু অনুলিপি চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। তাই বলা যায়, চট্টগ্রামসহ পূর্ব-বাংলার মুসলমানরা *নুরনামা* পাঠ করতে

পারত এবং শুনে বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারত। *নুরনামা* বহুভাষিক (multilingual) এবং এ অঞ্চলের মানুষ বহুভাষিক শব্দের সাথে সতেরো শতক থেকেই পরিচিত। দক্ষিণ এশীয় ভাষার ইতিহাসে একটি প্রচলিত প্রস্তাব হলো, আরবি-ফারসি মূলত রাজদরবারের ভাষা এবং শহুরে পরিবেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু *নুরনামা* মূলত গ্রামীণ পরিবেশে গ্রামীণ রীতি অনুসারে অনুলিপিকৃত এবং মূলত গ্রামাঞ্চলেই পঠিত হতো। এ বিবেচনায় থিবোর সিদ্ধান্ত হলো, সতেরো শতক থেকে শহুরে অঞ্চলের পাশাপাশি পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে আরবি-ফারসি ভাষা জানা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ছিল। এর পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যেমন, মালয়, জাভা প্রভৃতি সমুদ্র-উপকূলীয় এলাকাগুলিতে আরবির বিস্তারে 'oceanic domain' প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছিল। যার ফলে এসব অঞ্চলে স্থানীয় ভাষার সাথে আরবি ভাষার সমন্বয়ের মাধ্যমে নতুন ধরনের রীতি তৈরি হয়েছিল। আরবি হরফে তামিল লেখার প্রচলনের সাথে আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রচলনের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য হলো সমুদ্র সম্পর্কজাল (oceanic connections)। সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগের কারণে আরবি শব্দ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে (d'Hubert, 2022, p. 8-22)। আরবি হরফ থেকে বাংলায় রূপান্তরের সময় বটতলার পুথির ভূমিকাতে আরবি হরফে বাংলা ভাষাকে 'চট্টগ্রামের ভাষা' বলা হয়েছে। কারণ এসব পাঠের ভাষার সাথে চট্টগ্রামের কথিত ভাষার মিল রয়েছে। আবদুল করিম *শরীয়ত-নামা* সম্পাদনাকালে মন্তব্য করেছিলেন যে কাব্যটিতে 'প্রচুর আরবী, ফার্সী এবং চট্টগ্রামে প্রচলিত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে' (করিম, ১৯৭৪, পৃ. ২০৫)। কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের বহুভাষিক দক্ষতা ও কাব্য রচনার ক্ষেত্রে মুনশিয়ানার সাথে সেই দক্ষতার প্রয়োগ জাহির হয় সম্পাদক মহোদয়ের নিম্নোক্ত বক্তব্যে:

> কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের ... কবিত্ব শক্তি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ অল্প। তাঁর ছন্দ-চাতুর্য পাঠককে মুগ্ধ করে এবং আরবি-ফার্সি শব্দের বহুল ব্যবহার সত্ত্বেও ছন্দ-চাতুর্য বিশেষ ব্যাহত হয়নি; আরবি-ফার্সি শব্দ বাংলা শব্দের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেছে। কবি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং সেই কারণে অনেক চট্টগ্রামী শব্দ বা শিষ্ট শব্দের চট্টগ্রামী রূপ গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই পাওয়া যায়। আরবী ভাষার প্রভাবে চট্টগ্রামী চলিত ভাষায় নেতিবাচক শব্দে 'না' আগে ব্যবহৃত হয়; শরীয়ত-নামা গ্রন্থে এর প্রমাণ অহরহ পাওয়া যায় (করিম, ১৯৭৪, পৃ. ১৯৫-৯৬)।

গবেষক থিবো দুবের এবং আবদুল করিমের মতের মধ্যে কিছুটা সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ফলে এ রীতির উত্থানে আরবি ভাষা, বৃহত্তর সামুদ্রিক সাংস্কৃতিক বলয় এবং স্থানীয় পটভূমির যৌগিক মিশ্রণ অনস্বীকার্য। ফলে নিরাপদে উপসংহার টানা যায় যে, মধ্যযুগে বাংলা পুথি লেখা ও অনুলিপি করার ক্ষেত্রে সেমেটিক লিপি (আরবি ও ফারসি) ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলা ভাষা একটি বৃহৎ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আরবি-ফারসি ভাষা ও লিপি বাংলা সাহিত্যের আঞ্চলিক রীতি তৈরিতে বা নবরূপে বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। এর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল বহুভাষিক সাংস্কৃতিক বলয় এবং পুথিরীতিও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

৬) পুথি পাঠ ও পুথি প্রকাশ: শিকড়ের টানে বর্তমানের অনুসন্ধান

উনিশ শতকের ষাটের দশকে ফাদার রেভারেন্ড লং বাংলা বইয়ের তালিকা প্রদান করেন। ১৮৫৯ সালে তার লেখা 'Returns Relating to Publications in the Bengali Language in 1857' নিবন্ধে

তিনি বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত পুস্তকাদির পরিচয়, সেগুলির ভাষা বৈশিষ্ট্য, বিষয়াদি এবং বাঙালির বই পড়ার অভ্যাসকে চিত্রায়িত করেছিলেন নিম্নোক্ত ভাষায়:

> Though few Musalmans will attend English schools or allow themselves to be cast in the Saxon mould, yet there is a considerable amount of intelligence among them, of a love of reading on oriental subjects, then minds are not dead but dreaming, much might be done in preparing books for them got up tastefully. They speak Bengali but with a considerable intermixture of Persian or Urdu-terms, the books called Musalman Bengali are prepared on this plan, the idioms of terms are Persian, the language Bengali, it is in fact a compromise between Persian of Hindu, but as Bengali in the language of the court of the vernacular of the schools, this dialect will probably die away gradually. In Lord Cornowallis days Bengali Gentlemen wrote even on domestic affairs in Persian. These books are read chiefly by boatmen, who like Venice Gondoleers, are fond of song, by Musalman servants, shopkeepers. (Long, 1859, p. XXX-XXXI)

১৮৫৯ সালে প্রকাশিত পাদ্রী লঙের কথায় বাংলার মাঝি মাল্লার, কিংবা দোকানদার শ্রেণির পাঠাভাসে পুথির অর্ন্তভুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ধারণাটি থিবোর উপস্থাপিত প্রতর্ক, বাংলার শহুরে দুনিয়ার বাউন্ডারি ছাড়িয়ে পূর্ব-বাংলার গ্রামীণ সমাজেও পাঠ (পুথি পাঠ) তথা শিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল এবং তা শক্তিশালী করছিল।

প্রবন্ধের শুরুতে কাজী মোতাহার হোসেনের বাল্যকালের যে স্মৃতি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে তা বিশ শতকের শুরুতে বাংলার গ্রামীণ সমাজে বিদ্যমান পুথি পাঠাভাসের সাক্ষ্য। পাদ্রী লঙ এবং কাজী মোতাহার হোসেনের বক্তব্যের সূত্র ধরে শিকড়ের পানে ছোটার একটি প্রয়াস এই লেখার পরবর্তী অংশে নেওয়া হয়েছে। পুথি পাঠ, জারি গান এবং বাংলা পাঁচালি বিষয়ক বৈচিত্র্যময় গবেষণা করেছেন টনি কে স্টুয়ার্ট (Stewart, 2019), ইন্সিতা হালদার (Halder, 2023), ডেভিড কাসুন (Cashin, 1995), সাইমন জাকারিয়া (জাকারিয়া ও মর্তুজা, ২০১২) প্রমুখ গবেষকগণ। তাদের আলোচনার রাহা অনুসরণ করে চট্টগ্রাম অঞ্চলের পুথি-পাঠের কয়েকটি সামাজিক স্মৃতি নিচে উপস্থাপন করা হলো।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের স্মৃতিতে উনিশ শতকের শেষ দশকে তার নিজ এলাকায় পুথি-পাঠের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে মনে হয় তখনও পুথি-পাঠের আসর গ্রাম বাংলার সামাজিক পরিসরের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ ছিল। সাহিত্যবিশারদের নিম্নোক্ত বুলিতে বিষয়টি উঠে আসে:

> নিজ বাড়িতে ও পাড়া প্রতিবেশীর বাড়িতে তখন হামেশাই পুথি পড়ার মজলিশ বসিত। কিছু না বুঝিলেও সেই মজলিসে গিয়া আলাওলের পুথি পড়া শুনিতাম। শুনিয়া শুনিয়া আমার ভাবপ্রবণ কিশোর হৃদয়ে যে আনন্দ জন্মিত তাহার স্মৃতি এখনও মুছিয়া যায় নাই। এইভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি আমার একটা অনুরাগ জন্মে। তাহাই ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে মনকে সাহিত্যের বিশেষতঃ প্রাচীন সাহিত্যের রসাস্বাদনে একান্ত লোলুপ করিয়া তোলে।... প্রাচীন পুথির সন্ধান ও আবিষ্কার আমার যেন ধ্যানের বস্তু হইয়া ওঠে। সারা জীবন আমি ধ্যাননিমগ্ন যোগীর ন্যায় সেই এক ধ্যানেই কাটাইয়াছি (করিম, ১৯৯৪, পৃ. ২১৯)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার সামাজিক জীবনে পুথি-পাঠের প্রমাণ পাওয়া যায় উপর্যুক্ত বক্তব্যে। ইতিহাসবিদ আবদুল করিম বিগত শতকের ত্রিশের দশকের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে স্বীয় আত্মজীবনীতে নিজ গ্রামের সামাজিক কিছু রীতি তুলে ধরেছিলেন। এ রীতিগুলির মধ্যে বাংলা পুথি-পাঠের স্মৃতি খুব প্রবল। তিনি লিখেছেন:

> শীতকালে শীত পিঠা ধূমধাম করে খাওয়া হত; অবস্থাপন্ন লোকেরা বাটির সবাইকে অন্ততঃ একবার শীত পিঠা খাওয়াত। গ্রামে খেজুর গাছ ছিল, এবং প্রত্যেক পরিবারেই কিছু কিছু খেজুর গাছ থাকত; খেজুর রসের সংমিশ্রণে পিঠা খাওয়া উৎসবের মত ছিল। বিশেষ করে ... ভাপের পিঠা খাওয়ার প্রচলন খুব বেশি ছিল। গরম কালে রাতে পুঁথি পাঠের আসর বসত; পুঁথি পাঠের জন্য বিশেষ লোক ছিল; অল্প শিক্ষিত হলেও সুর করে পুঁথি পাঠে তারা পারদর্শী ছিল, তাদের সমাদরও বেড়ে যেত। পুঁথির মধ্যে জঙ্গনামা, আমীর হামজার পুঁথি, ভেলুয়া সুন্দরী ইত্যাদি বেশ জনপ্রিয় ছিল। মাঝে মাঝে পদ্মাবতী, সিকান্দারনামাও পাঠ করা হত। অশিক্ষিত লোকেরা মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে এই পুঁথিগুলিকে এমন হৃদয়গ্রাহী করে তুলত যে, না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। বিয়ে শাদী, খতনা, মেয়েদের কান বা নাক ফোঁড়নের সময়ও পুঁথি পাঠের আয়োজন করা হত। হিন্দু প্রধান গ্রামে শীতকালে নাচগানের আসর বসত, ছেলেরাই নাচত এবং গান করত; আমাদের গ্রামের ছেলেরা লুকিয়ে সেখানে গিয়ে নাচগান উপভোগ করত (করিম, ২০১৪, পৃ. ১৯)।

করিম আরো লিখেছেন, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ের আচার অনুষ্ঠানে ঢোল বাজনার ব্যবস্থা করা হতো। ঢোল বাজাবার সামর্থ্য না থাকলে অন্ততপক্ষে পুথি-পাঠ ও শহেলা গীতের (মেয়েলি গীত) ব্যবস্থা করতো। পুথি-পাঠে তেমন আপত্তি না থাকলেও শহেলা গীতে মৌলবি সাহেবের ঘোর আপত্তি ছিল। কেননা সাধারণত নারীরাই এ ধরনের গান করতো (করিম, ২০১৪, পৃ. ৩১)। আবদুল করিমের লেখায় বিশ শতকের ত্রিশের দশকেও পুথি-পাঠ বা পুথি বিষয়ক পাণ্ডিত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাওয়া যায়। তাঁর নিজের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বৈলছড়ি জুনিয়র মাদ্রাসার ইংরেজি-বাংলা এবং অঙ্কের তুখোড় শিক্ষক ছিলেন আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করা এই পণ্ডিত এত সুন্দর পড়াতেন যে তাঁর বিষয়ে বাড়ি গিয়ে আর পড়তে হতো না। করিমসহ অন্য শিক্ষার্থীদের মনে হতো যেন সকল অঙ্ক তাঁর মুখস্থ। এছাড়া প্রাচীন বাংলা পুথিসাহিত্যেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং আলাওলের *পদ্মাবতী*তে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন (করিম, ২০১৪, পৃ. ৪৮)।

ডিজিটাল ক্যামেরা আর মোবাইল ফোনের যুগে যে-কোনো সামাজিক ইভেন্ট রেকর্ড করা এখন মানুষের হাতের মোয়া। উনিশ-বিশ শতকের পুথি-পাঠের সামাজিক পরিসরকে ভিডিও রেকর্ড করার কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু জহির রায়হানের জাদুকরি কলমের ছোঁয়ায় *হাজার বছর ধরে* উপন্যাসে গ্রাম-বাংলার সামাজিক পরিসরে পুথি-পাঠের আসর হয়ে ওঠে জীবন্ত। উপন্যাস থেকে পুথি-পাঠের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু নিচে উদ্ধৃত করা হলো:

> চারপাশে ঝি ঝি পোকার অবিশ্রান্ত ডাক। মাঝে মাঝে গাছের মাথায় দু একটি পাখি হঠাৎ পাখা ঝাঁপটিয়ে আবার নীরব হয়ে যাচ্ছে। আকাশে ভরা চাঁদ হাসছে খলখলিয়ে। বাড়ির কাছে এসে পৌঁছতেই সুরত আলীর সুর করে পুঁথি পড়ার শব্দটা কানে এলো মন্তর।
>
> কইন্যা দেইখা গাজী মিয়ার চমক ভাঙ্গিলো।

কন্যার রূপেতে গাজী বেহুঁশ হইল।

উঠোনে বেশ বড় রকমের জটলা বেঁধেছে একটা। মাটিতে চাটাই বিছিয়ে বসেছে সবাই। আর তার মাঝখানে পিদিমের আলোতে পুথি পড়ছে সুরত। পুরুষরা তার ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেও মেয়েরা বসেছে একটু দূরে। যাদের বয়স কম তারা বসেছে আরো দূরে। দাওয়ার ওপরে। বুড়ো মকবুল গুড়ুম গুড়ুম হুঁকো টানছে আর বারবার প্রশংসা করছে সুরত আলীর পুথি পড়ার। বড় সুন্দর পুথি পড়ে সুরত আলী। এ গাঁয়ের সেরা পুথি পড়ুয়া সে। আকাশে যখন জোছনার বান ডাকে। ভরা চাঁদ খলখলিয়ে হাসে। দক্ষিণের মৃদুমন্দ বাতাস অতি ধীরে তার চিরুনি বুলিয়ে যায় গাছের পাতায়। কাক ডাকে না। চড়ুই আর শালিক কোন সাড়া দেয় না। গ্রামের সবাই সারা দিনের কর্মব্যস্ততার কথা ভুলে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেয়। নিঃশব্দ নিঝুম রাতে কুঁড়েঘরের ছায়াগুলো ধীরে ধীরে হেলে পড়ে উঠোনের মাঝখানে। তখন সুর করে পুথি পড়ে সুরত আলী। গাজী কালুর পুথি। ভেলুয়া সুন্দরীর পুথি।

শুন বন্ধুগণরে, শুন দিয়া মন।
ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্বজন ॥
কি কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান।
দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের পরাণ ॥
আকাশের চন্দ্র যেনরে ভেলুয়া সুন্দরী।
দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকূলের পরী ॥

উৎকর্ণ হয়ে শোনে সবাই। সুরত আলী পড়ে। ঢুলে ঢুলে সুর করে পড়ে সে। পুরুষেরা গুড়ুম গুড়ুম তামাক টানে। মেয়েরা পান চিবোয়। মাঝে মাঝে কমলার পুঁথিটাও পড়ে শোনায় সুরত। কমলার কিচ্ছা বর্ণনা সবার কাছে। কিচ্ছা নয়, একেবারে সত্য ঘটনা। হিরণ্য নগরের মেয়ে ছিল কমলা। যেমন রূপ তেমনি গুণ। ভোজ উৎসব করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে একদিন বিয়ে হয়ে গেলো তার হিরণ্য নগরের রাজকুমারের সাথে ।

... ...

পুথি পড়া শেষ হয়। কমলা সুন্দরী আর ভেলুয়া সুন্দরীর জন্যে অনেক অনেক আফসোস করে মেয়ে বুড়োরা। আঁচল দিয়ে চোখের পানি মোছে আমেনা। টুনির চোখ জোড়াও পানিতে টলটল করে ওঠে। ফকিরের মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সব খোদার ইচ্ছা, খোদা মাইরবার চাইলে কিনা করতে পারে। বুড়ো মকবুল কিছুক্ষণের জন্য হুঁকো টানতে ভুলে যায়। সে চুপ করে কি যেন ভাবে আর নীরব দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে আকাশের পানে। (রায়হান, ১৯৮৪, পৃ. ১৮-১৯)।

বাংলা পুথিবিষয়ক এ *কিসসা* খতম করতে চাই ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের একটি ফিল্ড-সার্ভের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। বর্তমান গবেষক অতীতের সূত্র ধরে পুথি ছাপানোর বর্তমান হালচাল বোঝার জন্য বাংলাবাজার-চকবাজারের বই-বাজারে পুথি-প্রকাশনা সংস্থা হামিদিয়া লাইব্রেরি এবং সুলেমানিয়া লাইব্রেরির খোঁজ করেন।[৭] গুগল ম্যাপের সাহায্যে সুলেমানিয়া লাইব্রেরির অবস্থান বাংলাবাজার জানা গেলেও হামিদিয়া লাইব্রেরির অবস্থান জানা যাচ্ছিল না (গুগল কখনো দেখাচ্ছিল হামিদিয়া লাইব্রেরি চকবাজারে। আবার কখনো দেখাচ্ছিল চকরোড, বাংলাবাজার)। চকবাজার শাহি মসজিদের পাশে হামিদিয়া লাইব্রেরির সাইনবোর্ডের সন্ধান মেলে; সাইনবোর্ডের মতো লাইব্রেরির অবস্থাও জীর্ণ।

লাইব্রেরির ভিতরে প্রবেশ করে মালিকের সাথে সংক্ষিপ্ত বাতচিতে উঠে আসে পুথি-প্রকাশের হালফিলের অবস্থা। মালিকের ভাষ্য হলো, ''আমাদের কাছে এখন পুথি নেই। ২০০৭-২০০৮ সাল পর্যন্ত পুথির চাহিদা ছিল। তবে স্মার্টফোন আসার ফলে মানুষের পুথির প্রতি আকর্ষণ কমে যায় এবং একপর্যায়ে পুথি বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। তাই আমরাও পুথি ছাপানো বন্ধ করে দেই। এছাড়া পুথি ছাপানোর ছাঁচগুলোও আমরা পুড়িয়ে ফেলেছি প্রয়োজন না থাকায়।''

হামিদিয়া লাইব্রেরির মালিক প্রদত্ত তথ্যের সূত্র ধরে চকবাজার শাহী মসজিদের নিচতলায় অবস্থিত মার্কেটে খুঁজে পাওয়া যায় আল আমিন লাইব্রেরি। বেচাকেনায় ব্যস্ত লাইব্রেরির মালিক জানান, তারাও আর পুথি ছাপান না এবং তাদের সংগ্রহেও কোনো পুথি নেই। আল আমিন এবং হামিদিয়া উভয় লাইব্রেরি এখন কোরআন শরিফ ও অন্যান্য ধর্মীয় কিতাব ছাপায় এবং বিক্রি করে। আল আমিন লাইব্রেরির মালিক বলেন, ''পুথি বিক্রি করত যেসব দোকান, ওই দোকানগুলো এখন তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে। তবে বাংলাবাজারে গেলে হয়তো পুথির সন্ধান পেলেও পেতে পারেন।'' তিনি সোলেমানিয়া লাইব্রেরির কার্ড বর্তমান গবেষককে দিয়ে বলেন, ''এই দোকানে পুথি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।''

পুরাতন ঢাকার বাংলাবাজারের বইয়ের মার্কেটে সোলেমানিয়া লাইব্রেরিতে (৩৬ বাংলা বাজার) বেশ কিছু ছাপানো পুথি পাওয়া যায়। মধ্যযুগে প্রচলিত এসব পুথি একুশ শতকেও বিরাজমান: *ছয়ফল মুল্লুক বদিউজ্জামাল*, *খায়রুল হাশর*, *আমির সওদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরীর পুঁথি*, *গাজি কালু ও চম্পাবতী কন্যার পুথি*, *জঙ্গনামা*, *দেলদার কুমার ও শাহাজাদী দিল পিঞ্জির কিচ্ছা*, *দোয়ায়ে গাঞ্জল আরশ*, *বড় ছায়েত নামা*। সোলেমানিয়া বুক হাউসের বর্তমান কর্ণধার বলেন, ''কিছু বয়স্ক মানুষ এখনো শখের বসে পুথি পাঠ করেন। তাই তারা নিকটস্থ ডিলারদের শরণাপন্ন হন পুথি কেনার জন্য। এসব ডিলার আবার তাদের কাছ থেকে পুথি নিতে আসেন। তাই তারা কিছু কপি বিক্রির উদ্দেশ্যে এখনো রেখেছেন। তবে এসব পুথির চাহিদা আগের মতো না থাকায় আমরা নতুন করে ছাপানো বন্ধ করে দিয়েছি এবং পুথি ছাপানোর ছাঁচগুলোও পুড়িয়ে ফেলেছি।'' তাদের কাছে জারি বা নবি-রাসুল সংক্রান্ত পুথি আছে কি না জানতে চাইলে বলেন, ''এখন এসব পুথি নেই এবং এই মার্কেটে অন্য দোকানেও থাকার সম্ভাবনা নেই।''

আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর ফেসবুকের যুগে সন্ধ্যা বা রাতে বৈদ্যুতিক বাতির কিংবা মোবাইল ফোনের ফ্ল্যাশ লাইট জালিয়ে পুথিপাঠের আসর খুঁজে বেড়ালে তা হয়তো 'অন্ধকার ঘরে কালো বেড়াল' খুঁজে বেড়ানোর মতোই হবে। বাংলা পুথি (বাংলা কিংবা সেমেটিক বর্ণমালা) অনুলিপি করার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কাজী মোতাহার হোসেন কিংবা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের পুথিপাঠের সামাজিক স্মৃতির দুনিয়া বর্তমানে বেদখল হয়েছে পাবজি আর ফায়ার ফক্সের মায়াজালে। গ্রাম-বাংলার কৈশোরের দুরন্তপনা আর *কাসাসুল আম্বিয়া* শোনার বদলে শর্টরিল আর ফেসবুক ভাইরাল যখন সামাজিক প্রবণতা, তখন হয়তো ভাষার সীমানা অতিক্রম করে বাংলা ভাষার বহুভাষিক চরিত্রের বহমানতা খোঁজা নিরর্থক। কিন্তু আজ থেকে দুই দশক আগেও নোকিয়া, সাজেম কিংবা মটোরোলা বাটন মোবাইল ফোন ব্যবহার করে বন্ধু বা প্রিয়জনকে জানানো বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা এসএমএস 'shubha nabarasha' কি ইংরেজি লিপিতে বাংলা লিখনরীতির প্রমাণ ছিল? এ যেন ইতিহাসের পুনর্জীবন। একুশ শতকে বাংলা

লেখার নতুন উপায়; প্রযুক্তির আর ভাষার বোঝাপড়ার নতুন দিগন্ত। এ বিষয়ে নানা সাওয়াল ওঠা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এ তো বাংলা ভাষারই বহুত্ববাদী চরিত্র।

টীকা

১. ইংরেজি Semite নামবাচক শব্দ থেকে গুণবাচক 'সেমেটিক' শব্দটি বাংলায় সেমেটীয় প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। *Oxford English Dictionary*-তে এ শব্দটির অর্থ দেওয়া আছে, "a member of any of the peoples mentioned in Genesis 10:21–31 as descended from Shem, one of the sons of Noah, traditionally interpreted as including the Hebrews, Aramaeans, Assyrians, and Arabs. Subsequently also: a member of any of the peoples who speak or spoke a Semitic language." (Oxford, 2024) সেমেটিক রিলিজিওন, সেমেটিক কালচার, সেমেটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইত্যাদি ইংরেজি শব্দের বহুল বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে সেমেটিক ধর্ম, সেমেটিক সংস্কৃতি এবং সেমেটিক ভাষা থেকে। সেমেটিক ধর্ম বলতে সচরাচর ইসলাম ও ইহুদি ধর্ম এবং সেমেটিক ভাষা বলতে আরবি ও হিব্রু ভাষাকেই নির্দিষ্ট করা হয়। বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য কিংবা প্রাচীন ফারটাইল ক্রিসেন্টে (দজলা-ফোরাত) সৃষ্ট সভ্যতাগুলির উত্তরসূরি আক্কাদিয়ান, ফনেশিয়ান, আরব ও ইহুদিদের সংস্কৃতি, ভাষা কিংবা ধর্ম বিষয়ক আলোচনা আম্ব্রেলা টার্ম হিসেবে সেমেটিক শব্দটি প্রচলিত। আরবি ভাষা ও লিপি যে সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, এ বিষয়ে দ্বিমত নেই (Gacek, 2009)। কিন্তু ফারসি ভাষার বিষয়টি কিছুটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। প্রায় তিন সহস্রাব্দ প্রাচীন ভাষা। প্রাক সাধারণ অব্দ ষষ্ঠ শতকে আকামেনীয় শাসনকালে (৫২২-৪৮৬ প্রাক সা. অব্দ) ফারসিকে ইরানে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে নবম শতকে আরবি লিপি ব্যবহার করে ফারসি লেখা হতে থাকে। ফারসি ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে দশম-একাদশ শতক হলো 'ক্লাসিক্যাল' বা ধ্রুপদী ফারসির সময়। ভাষার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে ফারসি কিউনিফর্ম, আরামিক, আবেস্তীয়, সিরিল্লিক এবং ল্যাটিন লিপিতে লেখা হয়েছে। ক্ল্যাসিকাল পর্যায় থেকে আরবি লিপির ২৮টি বর্ণের সাথে আরও ৪টি যোগ করে ফারসি ভাষা লিখিত কাঠামো দেখা যায়। (Orsatti, 2019) বলাই বাহুল্য এই রীতি এখনও চলমান। শিরোনামে ব্যবহৃত সেমেটিক শব্দটিকে বাংলা পুথি লিখনে আরবি ও ফারসি হরফের ব্যবহার নির্দেশ করতেই সেমেটিক প্রত্যয়টিকে আম্ব্রেলা টার্মের মতো ব্যবহার করা হয়েছে।

২. পাঁচটি পাণ্ডুলিপির সাহায্যে এই পাঠ প্রকাশ করা হয় (হাসান, ২০২০)। পাণ্ডুলিপিগুলির এক্সসেশন নাম্বার হলো: ক) নং ৩০২, এমএস ১৩৩, খ) নং ৩০৩, এমএস ১২৩ গ) নং ৩০৪, এমএস ৫৩৪ (Karim and Ahmad Sharif, 1960: 309-10) ঘ) নং ৩৬৩, এমএস ১২৪ এবং ঙ) সা.-বি. ৭৮৪ (Parvin, 2013: 28) ।

৩. বর্তমান গবেষণায় তিনটি পাণ্ডুলিপির (পুথি নং ৩০৩, ৩০৪ এবং ৩৬৩) সাহায্যে কাব্যটির কাহিনি-সংক্ষেপ পুনর্গঠন করার চেষ্টা করা হয়েছে (Karim and Ahmad Sharif, 1960, p. 309-10, 367)।

৪. পুথি নং ৩৬৩ [সাহিত্য বিশারদ ক্যাটালগ], এখানেই পুথিটির পৃষ্ঠা শেষ। এর পরের কাহিনি ৩০৩ নং পুথি থেকে পুনর্গঠন করা।

৫. ৩০৩ নং পুথির শেষ ফোলিওতে মুহচিত শব্দটি একাধিক বার পাওয়া যায়। মধ্যযুগের কাব্যে শব্দটি মুর্চ্ছা যাওয়া বা জ্ঞান হারানো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. পুথি নং ৩০৩ [সাহিত্য বিশারদ ক্যাটালগ] থেকে কাহিনির এ অংশটুকু পুনর্গঠন করা, এখানেই পুথিটির ফোলিও শেষ। এর পরের কাহিনি ৩০৪ নং পুথি থেকে পুনর্গঠন করা।

৭. বাংলা পুথি ছাপা ও প্রকাশনার তথ্য সংগ্রহের জন্য ২২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে বর্তমান গবেষকের নেতৃত্বে চকবাজার ও বাংলা বাজার এলাকার প্রকাশনা সংস্থাগুলির উপর একটি মাঠ জরিপ পরিচালনা করা হয়। এ জরিপে সহকারী তথ্যসংগ্রাহক ছিলেন জনাব মোস্তাফিজুর রহমান পলাশ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী)।

আকর সূত্র (primary sources)

অজ্ঞাত। *সকিনা বিলাপ*। সা.বি. ১২৪, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

অজ্ঞাত। *সকিনার চৌতিসা*। সা.বি. ৯১, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

খান, মুহাম্মদ। *কাসেমের লড়াই বা সকিনার চৌতিসা*। সা.বি. ৯০, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

তনু শেখ। *ফাতেমার সুরত নামা* (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি)। পুঁথি নং ৩০২, এমএস ১৩৩, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

তনু শেখ। *ফাতেমার সুরত নামা* (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি)। পুঁথি নং ৩০৩, এমএস ১২৩, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

তনু শেখ। *বিবি ফাতেমার সুরত নামা* (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি)। পুঁথি নং ৩০৪, এমএস ৫৩৪, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

রাজা, আলি। ওরফে কানু ফকির *জ্ঞান সাগর*। সা.বি. ১৪৬, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

সুলতান, *সৈয়দ*। *ইবলিশ নামা*। সা.বি. ৩৬, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

সুলতান, সৈয়দ। *ওফাতে রসূল*। সা.বি. ৪৮, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

হামজা, সৈয়দ। *আমির হামজা*। সা.বি. ১০, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

তথ্যসূত্র

করিম, আবদুল (১৯৯৪)। *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ: জীবন ও কর্ম*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

করিম, আবদুল (২০১৪)। *সমাজ ও জীবন: আত্মজীবনী*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

করিম, আবদুল (২০২৩)। *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের প্রবন্ধ সংগ্রহ (বিষয়: আলাওল)*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

করিম, আবদুল (১৩৮১ বঙ্গাব্দ)। 'কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার রচিত শরীয়ত-নামা'। আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত)। *পাণ্ডুলিপি*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৩-৩০৬।

কাইউম, মোহাম্মদ আব্দুল (২০০০)। *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা*। ঢাকা: গতিধারা।

জাকারিয়া, সাইমন ও নাজমীন মর্তুজাল (২০১২)। *ফোকলোর ও লিখিতসাহিত্য: জারিগানের আসরে বিষাদ-সিন্ধু আত্তীকরণ ও পরিবেশন পদ্ধতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

দুবের, থিবো (২০২০)। 'দেশি বচনের বিস্মৃত পাঠ: আরবি হরফে বাংলা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি'। *ভাবনগর*, খণ্ড ১২, সংখ্যা, ১৩-১৪: ১৪৪৮-৬২।

পারভীন, সৈয়দা সুলতানা, সুলতানা, শাহীন এবং আকবর, সৈয়দ আলী (সম্পা.) (২০০৬)। *পাণ্ডুলিপি পরিচয়*। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি।

মিয়া, মুহম্মদ শাহজাহান (১৯৮৪)। *বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমীক্ষা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

রহমান, এ. এ. (২০০৫)। *বাঙালা লিপির উৎস ও বিকাশের অজানা ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

রায়হান, জহির (১৯৮৪)। *হাজার বছর ধরে*। ঢাকা: সন্ধানী প্রকাশণী।

সাহিত্যবিশারদ, আবদুল করিম (১৩২১ বঙ্গাব্দ)। *পুথির বিবরণ*। কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

হক, এনামুল (৩য় সংস্করণ ২০০১)। *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

হাসান, শহিদুল (২০২০)। *ফাতেমার সুরতনামা শেরবাজ খান পাঠ ও সম্পাদনা*। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

হোসেন, কাজী মোতাহার। (২০২২, চতুর্থ মুদ্রণ, প্রথম প্রকাশ ২০০৪)। *স্মৃতিকথা*। ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী।

Cashin, David H (1995). *The Ocean of Love: Middle Bengali Sufi Literature and the Fakirs of Bengal*. Stockholm: Association of Oriental Studies, Stockholm University.

Chatterji, S. K. (1926). *Origin and Development of Bangla Language.* Calcutta: Calcutta University Press.

d'Hubert, T. (2022). *Meaningful Rituals: Persian, Arabic, and Bengali in the Nurnama Taradition of Eastern Bengal.* Delhi: Primus Books.

Gacek, Adam (2009) *Arabic Manuscripts A Vademecum For Readers Handbook Of Orient*, Leiden/Boston: Brill.

Halder, Ipsita (2023). *Reclaiming Karbala Nation, Islam and Literature of the Bengali Muslims*. New York: Routledge.

Irani, A. A. (2021). *The Muhammad Avatara: Salvation History, Translation, and the Making of Bengali Islam.* New York: Oxford University Press.

Karim, A., & Sharif, A. (1960). *A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts in Munshi Abdul Karim's Collection.* Dhaka: Dhaka.

Long, Rev. J. (1859). 'Returns Relating to Publications in the Bengali Language in 1857', *Selections from the Records of the Bengal Government*. No. XXXII. Calcutta: Calcutta Gazette Office.

Mannan, Q. A. (1974). (2nd rep) *The Emergence and Development of Dobhashi Literature in Bengal (upto 1855 A.D.).* Dhaka: Bangla Academy.

Orsatti, Paola 'Persian Language in Arabic Script: The Formation of the Orthographic Standard and the Different Graphic Traditions of Iran in the First Centuries of the Islamic Era' in Dmitry Bondarev, Alessandro Gori and Lameen Souag (eds.), *Creating Standards Interactions with Arabic script in 12 Manuscript Cultures*, Berlin/Boston: CPI books GmbH, Leck 2019: 40-70 *Oxford English Dictionary*, https://www.oed.com/dictionary/semite_n accessed on 11 November, 2024.

Parvin, Syeda Farid (compiled) (2013). An Alphabetic Index of Bengali Manuscripts. Abdul Karim Sahity Bisharad's Collections, Part III. Dhaka: Dhaka University Library.

Roy, A. (1983). *Islamic Syncretistic Tradition in Bengal.* Dhaka: Academic Publisher.

Stewart, T. K. (2019). *Witness to Marvels: Sufism and Literary Imagination.* California: University of California Press.